আনন্দপাঠ
(বাংলা দ্রুতপঠন)
ষষ্ঠ শ্রেণি
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২১ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

আনন্দপাঠ

(বাংলা দ্রুতপঠন)

ষষ্ঠ শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

ষষ্ঠ শ্রেণির **আনন্দপাঠ** বইটি শিক্ষার্থীদের জন্যে দ্রুতপঠনের পাঠ্যপুস্তক। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার বিকাশ ও তাদের মননতৃষ্ণা নিবারণের উদ্দেশ্যে বইখানি প্রণয়ন করা হয়েছে। বইটিতে বাংলা ভাষার লেখক ছাড়াও বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিকদের লেখার অনুবাদ সংকলন করা হয়েছে। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা দেশ-বিদেশের সাহিত্য সম্পর্কে তুলনামূলক ধারণা পাবে। বইটিতে সংকলিত রচনাগুলো বিষয়ের দিক থেকে একইসঙ্গে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও রসঘন। আশা করা যায়, পুস্তকখানি শিক্ষার্থীদের মনে আনন্দ যোগাবে এবং চিত্তের বিকাশ ঘটাবে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

সাত ভাই চম্পা

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

১.

এক রাজার সাত রানি। দেমাকে বড়ো রানিদের মাটিতে পা পড়ে না। ছোটো রানি খুব শান্ত। এই জন্য রাজা ছোটো রানিকে সকলের চাইতে বেশি ভালোবাসিতেন।

কিন্তু, অনেক দিন পর্যন্ত রাজার ছেলেমেয়ে হয় না। এত বড়ো রাজ্য, কে ভোগ করিবে? রাজা মনের দুঃখে থাকেন।

এইরূপে দিন যায়। কতদিন পরে— ছোটোরানির ছেলে হইবে। রাজার মনে, আনন্দ আর ধরে না; পাইক-পিয়াদা ডাকিয়া, রাজা, রাজ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন— 'রাজা রাজভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন, মিঠাইমণ্ডা মণি-মানিক যে যত পার, আসিয়া নিয়া যাও।'

বড়োরানিরা হিংসায় জ্বলিয়া মরিতে লাগিল।

রাজা আপনার কোমরে, ছোটোরানির কোমরে, এক সোনার শিকল বাঁধিয়া দিয়া বলিলেন, 'যখন ছেলে হইবে, এই শিকলে নাড়া দিয়ো, আমি আসিয়া ছেলে দেখিব!' বলিয়া রাজা রাজদরবারে গেলেন।

ছোটোরানির ছেলে হইবে, আঁতুড়ঘরে কে যাইবে? বড়োরানিরা বলিলেন, 'আহা ছোটোরানির ছেলে হইবে, তা অন্য লোক দিব কেন? আমরাই যাইব।'

বড়োরানিরা আঁতুড়ঘরে গিয়াই শিকলে নাড়া দিলেন। অমনি রাজসভা ভাঙিয়া, ঢাক-ঢোলের বাদ্য দিয়া, মণি-মানিক হাতে ঠাকুর-পুরুত সাথে, রাজা আসিয়া দেখেন— কিছুই না!

রাজা ফিরিয়া গেলেন।

রাজা সভায় বসিতে না-বসিতেই আবার শিকলে নাড়া পড়িল।

রাজা আবার ছুটিয়া গেলেন। গিয়া দেখেন, এবারও কিছুই না। মনের কষ্টে রাজা রাগ করিয়া বলিলেন, 'ছেলে না-হইতে আবার শিকল নাড়া দিলে, আমি সব রানিকে কাটিয়া ফেলিব।' বলিয়া রাজা চলিয়া গেলেন।

একে একে ছোটোরানির সাতটি ছেলে একটি মেয়ে হইল। আহা ছেলেমেয়েগুলি যে-চাঁদের পুতুল-ফুলের কলি। আঁকুপাঁকু করিয়া হাত নাড়ে, পা নাড়ে— আঁতুরঘর আলো হইয়া গেল।

ছোটোরানি আস্তে আস্তে বলিলেন, 'দিদি, কী ছেলে হইল একবার দেখাইলি না!'

বড়োরানিরা ছোটোরানির মুখের কাছে রঙ্গ-ভঙ্গি করিয়া হাত নাড়িয়া, নথ নাড়িয়া, বলিয়া উঠিল, 'ছেলে না, হাতি হইয়াছে— ওর আবার ছেলে হইবে! —কয়টা ইঁদুর আর কয়টা কাঁকড়া হইয়াছে।'

শুনিয়া ছোটোরানি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

নিষ্ঠুর বড়োরানিরা আর শিকলে নাড়া দিল না। চুপিচুপি হাঁড়ি-সরা আনিয়া, ছেলেমেয়েগুলিকে তাহাতে পুরিয়া, পাঁশগাদায় পুঁতিয়া ফেলিয়া আসিল। আসিয়া, তাহার পর শিকল ধরিয়া টান দিল।

রাজা আবার ঢাক-ঢোলের বাদ্য দিয়া, মণি-মানিক হাতে ঠাকুর-পুরুত সঙ্গে আসিলেন; বড়োরানিরা হাত মুছিয়া, মুখ মুছিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া কতকগুলি ব্যাঙের ছানা, ইঁদুরের ছানা আনিয়া দেখাইল।

দেখিয়া, রাজা আগুন হইয়া, ছোটোরানিকে রাজপুরীর বাহির করিয়া দিলেন।

বড়োরানিদের মুখে আর হাসি ধরে না; পায়ের মলের বাজনা থামে না, সুখের কাঁটা দূর হইল; রাজপুরীতে আগুন দিয়া, ঝগড়া-কোন্দল সৃষ্টি করিয়া, ছয় রানিতে মনের সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিলেন।

পোড়াকপালি ছোটোরানির দুঃখে গাছ-পাথর ফাটে, নদী-নালা শুকায়— ছোটোরানি ঘুঁটে-কুড়ানি দাসী হইয়া, পথে পথে ঘুরিতে লাগিলেন।

২.

এমনি করিয়া দিন যায়। রাজার মনে সুখ নাই, রাজার রাজ্যে সুখ নাই— রাজপুরী খাঁ খাঁ করে, রাজার বাগানে ফুল ফোটে না, রাজার পূজা হয় না।

একদিন মালি আসিয়া বলিল, 'মহারাজ, নিত্যপূজার ফুল পাই না, আজ যে, পাঁশগাদার উপরে, সাত চাঁপা এক পারুল গাছে, টুলটুলে সাত চাঁপা আর এক পারুল ফুটিয়া রহিয়াছে।'

রাজা বলিলেন, 'তবে সেই ফুল আন, পূজা করিব।'

মালি ফুল আনিতে গেল।

মালিকে দেখিয়া পারুলগাছে পারুলফুল চাঁপাফুলদিগে ডাকিয়া বলিল, 'সাত ভাই চম্পা জাগ রে!'

অমনি সাত চাঁপা নড়িয়া উঠিয়া সাড়া দিল—

'কেন বোন পারুল ডাক রে?'

পারুল বলিল, 'রাজার মালি এসেছে,
পূজার ফুল দিবে কি না দিবে?'

সাত চাঁপা তুরতুর করিয়া উপরে উঠিয়া গিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিতে লাগিল,

'না দিব, না দিব ফুল, উঠিব শতেক দূর,
আগে আসুক রাজা, তবে দিব ফুল!'

দেখিয়া শুনিয়া মালি অবাক হইয়া গেল। ফুলের সাজি ফেলিয়া, দৌড়িয়া গিয়া, রাজার কাছে খবর দিল। আশ্চর্য হইয়া, রাজা, রাজসভার সকলে সেইখানে আসিলেন।

৩.

রাজা আসিয়া ফুল তুলিতে গেলেন, অমনি পারুলফুল চাঁপাফুলদিগে ডাকিয়া বলিল,

'সাত ভাই চম্পা জাগ রে!'

চাঁপারা উত্তর দিল, 'কেন বোন পারুল ডাক রে?'

পারুল বলিল, 'রাজা আপনি এসেছেন,
ফুল দিবে কি না দিবে?'

চাঁপারা বলিল, 'না দিব, না দিব ফুল, উঠিব শতেক দূর,
আগে আসুক রাজার বড়োরানি তবে দিব ফুল!'

বলিয়া, চাঁপাফুলেরা আরও উঁচুতে উঠিল।

রাজা বড়োরানিকে ডাকাইলেন। বড়োরানি, মল বাজাইতে বাজাইতে আসিয়া ফুল তুলিতে গেল। চাঁপাফুলেরা বলিল,

'না দিব, না দিব ফুল, উঠিব শতেক দূর,
আগে আসুক রাজার মেজোরানি তবে দিব ফুল!'

তাহার পর মেজো রানি আসিলেন, সেজো রানি আসিলেন, নোয়া রানি আসিলেন, কনে রানি আসিলেন কেহই ফুল পাইলেন না। ফুলেরা গিয়া আকাশে তারার মতো ফুটিয়া রহিল।

রাজা গালে হাত দিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন।

শেষে দুয়োরানি আসিলেন; তখন ফুলেরা বলিল,

'না দিব, না দিব ফুল, উঠিব শতেক দূর,
যদি আসে রাজার ঘুঁটে-কুড়ানি দাসী,
তবে দিব ফুল।'

তখন খোঁজ-খোঁজ পড়িয়া গেল। রাজা চৌদোলা পাঠাইয়া দিলেন, পাইক বেহারারা চৌদোলা লইয়া মাঠে গিয়া ঘুঁটে-কুড়ানি দাসী ছোটোরানিকে লইয়া আসিল।

ছোটোরানির হাতে পায়ে গোবর, পরনে ছেঁড়া কাপড়, তাই লইয়া তিনি ফুল তুলিতে গেলেন। অমনি সুড়সুড় করিয়া চাঁপারা আকাশ হইতে নামিয়া আসিল, পারুল ফুলটি গিয়া তাদের সঙ্গে মিশিল; ফুলের মধ্য হইতে সুন্দর সুন্দর চাঁদের মতো সাত রাজপুত্র এক রাজকন্যা 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিয়া, ঝুপঝুপ করিয়া ঘুঁটে-কুড়ানি দাসী ছোটোরানির কোলে-কাঁখে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সকলে অবাক! রাজার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল গড়াইয়া গেল। বড়োরানিরা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

রাজা তখনি বড়োরানিদিগকে কঠিন শাস্তি দিয়া সাত রাজপুত্র, পারুল-মেয়ে আর ছোটোরানিকে লইয়া রাজপুরীতে গেলেন।

রাজপুরীতে জয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল।

লেখক-পরিচিতি

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার বিখ্যাতসব রূপকথার রচয়িতা এবং শিশু-সাহিত্যিক। প্রধানত 'ঠাকুরমার ঝুলি' নামক বইয়ের জন্যে বাঙালি পাঠকসমাজে তিনি অধিক পরিচিত। তাঁর জন্ম ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার উলাইল এলাকার কর্ণপাড়া গ্রামে। লোকসাহিত্যের সংগ্রাহক, ছড়াকার, চিত্রশিল্পী হিসেবেও তিনি বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন। তাঁর সংগৃহীত জনপ্রিয় রূপকথার সংকলন– 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝুলি', 'ঠানদিদির থলে' ও 'দাদা মশায়ের থলে'। ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

'সাত ভাই চম্পা' একটি রূপকথা-জাতীয় গল্প। গল্পটিতে দেখা যায়, ছোটো রানির সন্তান হলে বড়ো রানিরা হিংসায় ফেটে পড়ে। তারা ছোটোরানির সাতটি ছেলে ও একটি মেয়েকে হাঁড়িতে করে সরা-চাপা দিয়ে পাঁশগাদায় পুঁতে রাখে। একসময় সাতটি ছেলে সাতটি চাঁপা ফুলগাছ এবং মেয়েটি একটি পারুল ফুলগাছে পরিণত হয়। মালি পূজার জন্য একদিন সেই বাগানে ফুল তুলতে গেলে পারুল তার ভাইদের ডেকে বলে 'সাত ভাই চম্পা জাগো রে'। ভাইয়েরা মালিকে ফুল না দিয়ে একে একে রাজা, বড়োরানিদের এবং সব শেষে ঘুঁটে-কুড়ানি ছোটোরানিকে ডেকে পাঠায়। ছোটোরানিকে নিয়ে আসার পর বড়োরানিদের ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। রাজা বড়োরানিদের রাজপ্রাসাদ থেকে বের করে দেন এবং ছোটোরানি, সাত রাজপুত্র ও রাজকন্যা পারুলকে নিয়ে প্রাসাদে ফিরে আসেন।

মানুষের প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ ভালো কিছু বয়ে আনতে পারে না। মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করলেও সত্য একদিন প্রকাশ পায়।

শব্দার্থ ও টীকা

দেমাক — অহংকার। শব্দটি এসেছে আরবি 'দিমাগ' শব্দ থেকে।
পাইক — পিয়াদা-রাজকর্মচারী। যেমন: পদাতিক সৈন্য, পত্রবাহক, লাঠিয়াল ইত্যাদি।
আঁতুড়ঘর — শিশুর জন্ম হয় যে ঘরে।
ঠাকুর-পুরুত — ঠাকুর-পুরোহিত, যাঁরা পূজা পরিচালনা করেন।
আঁকুপাঁকু — ব্যাকুলতা প্রকাশ।
রঙ্গ-ভঙ্গি — রং-ঢঙের ভঙ্গি।
নথ — নাকে পরার জন্য একধরনের অলংকার।
পাঁশগাদা — ছাইয়ের স্তূপ।
পুঁতিয়া — মাটি চাপা দিয়ে।
মল — পায়ের অলংকার বিশেষ।
পোড়াকপালি — দুর্ভাগা।
ঘুঁটে-কুড়ানি — গোবরের তৈরি জ্বালানি সংগ্রহ করে যে।
নিত্যপূজা — প্রতিদিনের পূজা অনুষ্ঠান।
তুরতুর — দ্রুত, তাড়াতাড়ি।
টুলটুলে — সুন্দর প্রকাশক শব্দ।
নোয়া রানি — চতুর্থ রানি।
দুয়োরানি — স্বামীর সোহাগবঞ্চিত নারী। এখানে ষষ্ঠ রানি।
চৌদোলা — পালকি।
বেহারা — পালকিবাহক।
কাঁখ — কোমর।
জয়ডঙ্কা — জয়সূচক বাদ্যধ্বনি।

আলাউদ্দিনের চেরাগ

হুমায়ূন আহমেদ

নান্দিনা পাইলট হাইস্কুলের অঙ্ক-শিক্ষক নিশানাথবাবু কিছুদিন হলো রিটায়ার করেছেন। আরো বছরখানেক চাকরি করতে পারতেন; কিন্তু করলেন না। কারণ দুটো চোখেই ছানি পড়েছে। পরিষ্কার কিছু দেখেন না। ব্ল্যাকবোর্ডে নিজের লেখা নিজেই পড়তে পারেন না।

নিশানাথবাবুর ছেলেমেয়ে কেউ নেই। একটা মেয়ে ছিল। খুব ছোটোবেলায় টাইফয়েডে মারা গেছে। তার স্ত্রী মারা গেছেন গত বছর। এখন তিনি একা একা থাকেন। তার বাসা নান্দিনা বাজারের কাছে। পুরান আমলের দু-কামরার একটা পাকা দালানে তিনি থাকেন। কামরা দুটির একটি পুরোনো লক্কড় জিনিসপত্র দিয়ে ঠাসা। তার নিজের জিনিস নয়। বাড়িওয়ালার জিনিস। ভাঙা খাট, ভাঙা চেয়ার, পেতলের তলা-নেই কিছু ডেগচি, বাসনকোসন। বাড়িওয়ালা নিশানাথবাবুকে প্রায়ই বলেন, এই সব জঞ্জাল দূর করে ঘরটা আপনাকে পরিষ্কার করে দেবো। শেষপর্যন্ত করেন না। তাতে নিশানাথবাবুর খুব একটা অসুবিধাও হয় না। পাশে একটা হোটেলে তিনি খাওয়া দাওয়া সারেন। বিকেলে নদীর ধারে একটু হাঁটতে যান। সন্ধ্যার পর নিজের ঘরে এসে চুপচাপ বসে থাকেন। তার একটা কেরোসিনের স্টোভ আছে। রাতের বেলা চা খেতে ইচ্ছা হলে স্টোভ জ্বালিয়ে নিজেই চা বানান।

জীবনটা তার বেশ কষ্টেই যাচ্ছে। তবে তা নিয়ে নিশানাথবাবু মন খারাপ করেন না। মনে মনে বলেন, আর অল্প-কটা দিনই তো বাঁচব, একটু না হয় কষ্ট করলাম। আমার চেয়ে বেশি কষ্টে কত মানুষ আছে। আমার আর আবার এমনকি কষ্ট।

একদিন কার্তিক মাসের সন্ধ্যাবেলায় নিশানাথবাবু তার স্বভাবমতো সকাল সকাল রাতের খাওয়া সেরে নিয়ে বেড়াতে বেরোলেন। নদীর পাশের বাঁধের ওপর দিয়ে অনেকক্ষণ হাঁটলেন। চোখে কম দেখলেও অসুবিধা হয় না, কারণ গত কুড়ি বছর ধরে এই পথে তিনি হাঁটাহাঁটি করছেন।

আজ অবশ্য একটু অসুবিধা হলো। তার চটির একটা পেরেক উঁচু হয়ে গেছে। পায়ে লাগছে। হাঁটতে পারছেন না। তিনি সকাল সকাল বাড়ি ফিরলেন। তার শরীরটাও আজ খারাপ। চোখে যন্ত্রণা হচ্ছে। বাঁ চোখ দিয়ে ক্রমাগত পানি পড়ছে।

বাড়ি ফিরে তিনি খানিকক্ষণ বারান্দায় বসে রইলেন। রাত নটার দিকে তিনি ঘুমুতে যান। নটা বাজতে এখনো অনেক দেরি। সময় কাটানোটাই তার এখন সমস্যা। কিছু-একটা কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পারলে হতো। কিন্তু হাতে কোনো কাজ নেই। বসে থাকা ছাড়া কিছু করার নেই। চটির উঁচু-হয়ে-থাকা পেরেকটা ঠিক করলে কেমন হয়? কিছুটা সময় তো কাটে। তিনি চটি হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। হাতুড়িজাতীয় কিছু খুঁজে পেলেন না। জঞ্জাল রাখার ঘরটিতে উঁকি দিলেন। রাজ্যের জিনিস সেখানে; কিন্তু হাতুড়ি বা তার কাছাকাছি কিছু নেই। মন খারাপ করে বের হয়ে আসছিলেন, হঠাৎ দেখলেন,ঝুড়ির ভেতর একগাদা জিনিসের মধ্যে লম্বাটে ধরনের কী-একটা যেন দেখা যাচ্ছে। তিনি জিনিসটা হাতে নিয়ে জুতার পেরেকে বাড়ি দিতেই অদ্ভুত কাণ্ড হলো। কালো ধোঁয়ায় ঘর ভর্তি হয়ে গেল।

তিনি ভাবলেন, চোখের গন্ডগোল। চোখ-দুটো বড়ো যন্ত্রণা দিচ্ছে। কিন্তু না, চোখের গন্ডগোল না। কিছুক্ষণের মধ্যে ধোঁয়া কেটে গেল। নিশানাথবাবু অবাক হয়ে শুনলেন, মেঘগর্জনের মতো শব্দে কে যেন বলছে, আপনার দাস আপনার সামনে উপস্থিত। হুকুম করুন। এক্ষুনি তালিম হবে।

নিশানাথবাবু কাঁপা গলায় বললেন, কে? কে কথা বলে?

: জনাব আমি। আপনার ডান দিকে বসে আছি। ডান দিকে ফিরলেই আমাকে দেখবেন।

নিশানাথবাবু ডান দিকে ফিরতেই তার গায়ে কাঁটা দিল। পাহাড়ের মতো একটা কী যেন বসে আছে। মাথা প্রায় ঘরের ছাদে গিয়ে লেগেছে। নিশ্চয়ই চোখের ভুল।

নিশানাথবাবু ভয়ে ভয়ে বললেন, বাবা তুমি কে? চিনতে পারলাম না তো।

: আমি হচ্ছি আলাউদ্দিনের চেরাগের দৈত্য। আপনি যে-জিনিসটি হাতে নিয়ে বসে আছেন এটাই হচ্ছে সেই বিখ্যাত আলাউদ্দিনের চেরাগ।

: বলো কী!

: সত্যি কথাই বলছি জনাব। দীর্ঘদিন এখানে-ওখানে পড়ে ছিল। কেউ ব্যবহার জানে না বলে ব্যবহার হয়নি। পাঁচ হাজার বছর পর আপনি প্রথম ব্যবহার করলেন। এখন হুকুম করুন।

: কী হুকুম করব?

: আপনি যা চান বলুন, এক্ষুনি নিয়ে আসব। কোন জিনিসটি আপনার প্রয়োজন?

: আমার তো কোনো জিনিসের প্রয়োজন নেই।

চেরাগের দৈত্য চোখ বড়ো বড়ো করে অনেকক্ষণ নিশানাথবাবুর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, জনাব, আপনি কি আমাকে ভয় পাচ্ছেন?

: প্রথমে পেয়েছিলাম, এখন পাচ্ছি না। তোমার মাথায় ওই দুটা কী ? শিং নাকি?

: জি, শিং।

: বিশ্রী দেখাচ্ছে।

চেরাগের দৈত্য মনে হলো একটু বেজার হয়েছে। মাথার লম্বা চুল দিয়ে সে শিং দুটো ঢেকে দেবার চেষ্টা করতে করতে বলল, এখন বলুন কী চান?

: বললাম তো, কিছু চাই না।

: আমাদের ডেকে আনলে কোনো-একটা কাজ করতে দিতে হয়। কাজ না করা পর্যন্ত আমরা চেরাগের ভেতর ঢুকতে পারি না।

অনেক ভেবেচিন্তে নিশানাথবাবু বললেন, আমার চটির পেরেকটা ঠিক করে দাও। অমনি দৈত্য আঙুল দিয়ে প্রচণ্ড চাপ দিয়ে পেরেক ঠিক করে বলল,

: এখন আমি আবার চেরাগের ভেতর ঢুকে যাব। যদি আবার দরকার হয় চেরাগটা দিয়ে লোহা বা তামার ওপর খুব জোরে বাড়ি দেবেন। আগে চেরাগ একটুখানি ঘষলেই আমি চলে আসতাম। এখন আসি না। চেরাগ পুরোনো হয়ে গেছে তো, তাই।

: ও আচ্ছা। চেরাগের ভেতরেই তুমি থাক?

: জি।

: কর কী?

: ঘুমোই। তাহলে জনাব আমি এখন যাই।

বলতে বলতেই সে ধোঁয়া হয়ে চেরাগের ভেতর ঢুকে গেল। নিশানাথবাবু স্তম্ভিত হয়ে দীর্ঘ সময় বসে রইলেন। তারপর তার মনে হলো—এটা স্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয়। বসে ঝিমাতে ঝিমাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুমের মধ্যে আজেবাজে স্বপ্ন দেখেছেন।

তিনি হাতমুখ ধুয়ে শুয়ে পড়লেন। পরদিন তার আর এত ঘটনার কথা মনে রইল না। তার খাটের নিচে পড়ে রইল আলাউদ্দিনের বিখ্যাত চেরাগ।

মাসখানেক পার হয়ে গেল। নিশানাথবাবুর শরীর আরো খারাপ হলো। এখন তিনি আর হাঁটাহাঁটিও করতে পারেন না। বেশির ভাগ সময় বিছানায় শুয়ে-বসে থাকেন। এক রাতে ঘুমোতে যাবেন। মশারি খাটাতে গিয়ে দেখেন, একদিকের পেরেক খুলে এসেছে। পেরেক বসানোর জন্যে আলাউদ্দিনের চেরাগ দিয়ে এক বাড়ি দিতেই ওই রাতের মতো হলো। তিনি শুনলেন গম্ভীর গলায় কে যেন বলছে–

: জনাব, আপনার দাস উপস্থিত। হুকুম করুন।

: তুমি কে?

: সে কি! এর মধ্যে ভুলে গেলেন? আমি আলাউদ্দিনের চেরাগের দৈত্য।

: ও আচ্ছা, আচ্ছা। আরেক দিন তুমি এসেছিলে।

: জি।

: আমি ভেবেছিলাম– বোধ হয় স্বপ্ন।

: মোটেই স্বপ্ন না। আমার দিকে তাকান। তাকালেই বুঝবেন– এটা সত্য।

: তাকালেও কিছু দেখি না রে বাবা। চোখ-দুটো গেছে।

: চিকিৎসা করাচ্ছেন না কেন?

: টাকা কোথায় চিকিৎসা করার?

: কী মুশকিল! আমাকে বললেই তো আমি নিয়ে আসি। যদি বলেন তো এক্ষুনি এক কলসি সোনার মোহর এনে আপনার খাটের নিচে রেখে দেই।

: আরে না, এত টাকা দিয়ে আমি করব কী? কদিনই-বা বাঁচব।

: তাহলে আমাকে কোনো-একটা কাজ দিন। কাজ না করলে তো চেরাগের ভেতর যেতে পারি না।

: বেশ, মশারিটা খাটিয়ে দাও।

দৈত্য খুব যত্ন করে মশারি খাটালো। মশারি দেখে সে খুব অবাক। পাঁচ হাজার বছর আগে নাকি এই জিনিস ছিল না। মশার হাত থেকে বাঁচার জন্য মানুষ যে কায়দা বের করেছে, তা দেখে সে মুগ্ধ।

: জনাব, আর কিছু করতে হবে?

: না, আর কী করবে! যাও এখন।

: অন্য কিছু করার থাকলে বলুন, করে দিচ্ছি।

: চা বানাতে পারো?

: জি না। কীভাবে বানায়?

; দুধ-চিনি মিশিয়ে।

: না, আমি জানি না। আমাকে শিখিয়ে দিন।

: থাক বাদ দাও, আমি শুয়ে পড়ব।

দৈত্য মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, আপনার মতো অদ্ভুত মানুষ জনাব আমি এর আগে দেখিনি।

: কেন?

: আলাউদ্দিনের চেরাগ হাতে পেলে সবার মাথা খারাপের মতো হয়ে যায়। কী চাইবে, কী না চাইবে, বুঝে উঠতে পারে না, আর আপনি কিনা...

নিশানাথবাবু বিছানায় শুয়ে পড়লেন। দৈত্য বলল, আমি কি আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দেব? তাতে ঘুমোতে আরাম হবে।

: আচ্ছা দাও।

দৈত্য মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। নিশানাথবাবু ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম ভাঙলে মনে হলো, আগের রাতে যা দেখেছেন সবই স্বপ্ন। আলাউদ্দিনের চেরাগ হচ্ছে রূপকথার গল্প। বাস্তবে কি তা হয়? হয় না। হওয়া সম্ভব না।

দুঃখেকষ্টে নিশানাথবাবুর দিন কাটতে লাগল। শীতের শেষে তার কষ্ট চরমে উঠল। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না এমন অবস্থা। হোটেলের একটা ছেলে দুবেলা খাবার নিয়ে আসে। সেই খাবারও মুখে দিতে পারেন না। স্কুলের পুরোনো স্যাররা মাঝে মাঝে তাকে দেখতে এসে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেন। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেন, এ-যাত্রা আর টিকবে না। বেচারা বড়ো কষ্ট করল। তারা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে তিন শ টাকা নিশানাথবাবুকে দিয়ে এলেন। তিনি বড়ো লজ্জায় পড়লেন। কারো কাছ থেকে টাকা নিতে তার বড়ো লজ্জা লাগে।

এক রাতে তার জ্বর খুব বাড়ল। সেই সঙ্গে পানির পিপাসায় ছটফট করতে লাগলেন। বাতের ব্যথায় এমন হয়েছে যে বিছানা ছেড়ে নামতে পারছেন না। তিনি করুণ গলায় একটু পরপর বলতে লাগলেন— পানি, পানি।

গম্ভীর গলায় কে-একজন বলল, নিন জনাব পানি।

: তুমি কে?

: আমি আলাউদ্দিনের চেরাগের দৈত্য।

: ও আচ্ছা, তুমি।

: নিন, আপনি খান। আমি আপনাতেই চলে এলাম। যা অবস্থা দেখছি, না এসে পারলাম না।

: শরীরটা বড়োই খারাপ করেছে রে বাবা।

: আপনি ডাক্তারের কাছে যাবেন না, টাকাপয়সা নেবেন না, আমি কী করব, বলুন?

: তা তো ঠিকই, তুমি আর কী করবে।

: আপনার অবস্থা দেখে মনটাই খারাপ হয়েছে। নিজ থেকেই আমি আপনার জন্য একটা জিনিস এনেছি। এটা আপনাকে নিতে হবে। না নিলে খুব রাগ করব।

: কী জিনিস?

: একটা পরশপাথর নিয়ে এসেছি।

: সে কী! পরশপাথর কি সত্যি সত্যি আছে নাকি?

: থাকবে না কেন? এই তো, দেখুন। হাতে নিয়ে দেখুন।

নিশানাথবাবু পাথরটা হাতে নিলেন। পায়রার ডিমের মতো ছোটো। কুচকুচে কালো একটা পাথর। অসম্ভব মসৃণ।

: এটাই বুঝি পরশপাথর?

: জি। এই পাথর ধাতুর তৈরি যে-কোনো জিনিসের গায়ে লাগালে সেই জিনিস সোনা হয়ে যাবে। দাঁড়ান, আপনাকে দেখাচ্ছি।

দৈত্য খুঁজে খুঁজে বিশাল এক বালতি নিয়ে এল। পরশপাথর সেই বালতির গায়ে লাগাতেই কাঁচা হলুদ রঙের আভায় বালতি ঝকমক করতে লাগল।

: দেখলেন?

: হ্যাঁ, দেখলাম। সত্যি সত্যি সোনা হয়েছে?

: হ্যাঁ, সত্যি সোনা।

; এখন এই বালতি দিয়ে আমি কী করব?

: আপনি অদ্ভুত লোক, এই বালতির কত দাম এখন জানেন? এর মধ্যে আছে কুড়ি সের সোনা। ইচ্ছা করলেই পরশপাথর ছুঁইয়ে আপনি লক্ষ লক্ষ টন সোনা বানাতে পারেন।

নিশানাথবাবু কিছু বললেন না, চুপ করে রইলেন। দৈত্য বলল, আলাউদ্দিনের চেরাগ যে-ই হাতে পায়, সে-ই বলে পরশপাথর এনে দেবার জন্য। কাউকে দিই না।

: দাও না কেন?

: লোভী মানুষদের হাতে এসব দিতে নেই। এসব দিতে হয় নির্লোভ মানুষকে। নিন, পরশপাথরটা যত্ন করে রেখে দিন।

: আমার লাগবে না। যখন লাগবে তোমার কাছে চাইব।

নিশানাথবাবু পাশ ফিরে শুলেন।

পরদিন জ্বরে তিনি প্রায় অচৈতন্য হয়ে গেলেন। স্কুলের স্যাররা তাকে ময়মনসিংহ হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিলেন। ডাক্তাররা মাথা নেড়ে বললেন–

: অবস্থা খুবই খারাপ। রাতটা কাটে কি না সন্দেহ।

নিশানাথবাবু মারা গেলেন পরদিন ভোর ছটায়। মৃত্যুর আগে নান্দিনা হাইস্কুলের হেডমাস্টার সাহেবকে কানে কানে বললেন, আমার ঘরে একটা বড়ো বালতি আছে। ওইটা আমি স্কুলকে দিলাম। আপনি মনে করে বালতিটা নেবেন।

: নিশ্চয়ই নেব।

: খুব দামি বালতি...

: আপনি কথা বলবেন না। কথা বলতে আপনার কষ্ট হচ্ছে। চুপ করে শুয়ে থাকুন।

কথা বলতে তার সত্যি সত্যি কষ্ট হচ্ছিল। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। বালতিটা যে সোনার তৈরি এটা তিনি বলে যেতে পারলেন না।

হেডমাস্টার সাহেব ওই বালতি নিয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন– বাহ্, কী সুন্দর বালতি! কী চমৎকার ঝকঝকে হলুদ! পেতলের বালতি, কিন্তু রংটা বড়ো সুন্দর।

দীর্ঘদিন নান্দিনা হাইস্কুলের বারান্দায় বালতিটা পড়ে রইল। বালতি-ভরতি থাকত পানি। পানির ওপর একটা মগ ভাসত। সেই মগে করে ছাত্ররা পানি খেত।

তারপর বালতিটা চুরি হয়ে যায়। কে জানে এখন সেই বালতি কোথায় আছে!

লেখক-পরিচিতি

হুমায়ূন আহমেদ বাংলা সাহিত্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে নেত্রকোনা জেলায় তাঁর জন্ম। উপন্যাস, ছোটোগল্প, রম্যরচনা, ভ্রমণকাহিনি ও বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি মিলিয়ে তাঁর বইয়ের সংখ্যা প্রচুর। নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবেও তিনি বিখ্যাত। হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হাস্যরস ও নাটকীয়তা। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস– 'নন্দিত নরকে', 'শঙ্খনীল কারাগার', 'এইসব দিনরাত্রি' প্রভৃতি। মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে তিনি লিখেছেন 'আগুনের পরশমণি', 'শ্যামল ছায়া', 'জোছনা ও জননীর গল্প' প্রভৃতি উপন্যাস। শিশুকিশোরদের জন্য লেখা বইগুলোর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য– 'বোতল ভূত', 'তোমাদের জন্য ভালোবাসা' প্রভৃতি। ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে হুমায়ূন আহমেদ মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

নিশানাথবাবু গণিতের অবসরপ্রাপ্ত স্কুল-শিক্ষক। চোখে কম দেখেন। স্ত্রী-সন্তান বেঁচে না-থাকায় তিনি নিঃসঙ্গ একজন মানুষ। একদিন তাঁর ছেঁড়া চটির পেরেক উঁচু হয়ে যাওয়ায় চটিজোড়া ব্যবহারে অসুবিধা হচ্ছিল। পরে ঘরের জঞ্জাল থেকে একটা ধাতব পুরোনো চেরাগ খুঁজে পেয়ে সেটা দিয়ে জুতোতে বাড়ি দিতেই আলাউদ্দিনের দৈত্য এসে হাজির হয়। নিশানাথবাবু চাইলেই দৈত্যের কাছ থেকে মূল্যবান অনেক কিছু পেতে পারতেন; কিন্তু তিনি কিছু চাননি। সম্পদের লোভ তাঁকে স্পর্শ করেনি। তাই তিনি দৈত্যের কাছ থেকে কোনো বাড়তি সুবিধা নিতে রাজি নন। তাঁর প্রাক্তন সহকর্মীরা চাঁদা তুলে তাঁকে সাহায্য করে। সে টাকা নিতেও তিনি লজ্জা পান। দৈত্য স্বেচ্ছায় নিশানাথবাবুকে পরশপাথর দিতে চায়। তা গ্রহণেও তিনি অস্বীকৃতি জানান। এ-গল্পে হুমায়ূন আহমেদ আরব্য-রজনীর গল্পের দৈত্য-চরিত্রের সঙ্গে বাংলাদেশের একজন সাধারণ শিক্ষকের সম্পর্ক দেখান। লেখকের কল্পনাপ্রতিভা ও প্রকাশভঙ্গির নৈপুণ্যে গল্পে উঠে এসেছে একজন নির্লোভ মানুষের ছবি, দারিদ্র্যে যিনি কষ্ট ভোগ করলেও থেকেছেন লোভহীন ও মহৎ।

মনুষ্যত্বের প্রবল শক্তি এ-গল্পে দারিদ্র্যকে পরাজিত করেছে। গল্পটি আমাদের আত্মসম্মানবোধ, নির্লোভ মানসিকতা ও মহত্ত্বের শিক্ষা দেয়।

শব্দার্থ ও টীকা

চেরাগ — বাতি; প্রদীপ।

আলাউদ্দিনের চেরাগ — আরব দেশে একটি গল্প প্রচলিত আছে। সে গল্পে একটি বিশেষ চেরাগের উল্লেখ আছে, যা ঘষলে চেরাগ বা প্রদীপ থেকে দৈত্য বেরিয়ে আসে। সে দৈত্য চেরাগের মালিকের অধীন হয়ে যায়। মালিকের সব ইচ্ছা পূরণ করে এ দৈত্য। চেরাগের মালিক ছিল আলাউদ্দিন।

রিটায়ার — চাকরি শেষ হওয়ার পর অবসর নেওয়া। ইংরেজি Retire.

চোখের ছানি — চোখের একধরনের রোগ। চোখের ওপর হালকা আবরণ যা চোখের দৃষ্টিকমিয়ে দেয়।

ব্ল্যাকবোর্ড — শ্রেণিকক্ষে চক দিয়ে লেখা হয় যেখানে। শ্রেণিকক্ষে কাঠের তৈরি এমন বোর্ড, যার ওপর চক দিয়ে লেখা বা ছবি আঁকা যায়। ইংরেজি Blackboard.

টাইফয়েড — এক ধরনের পানিবাহিত রোগ। বিশেষ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত হয়, এমন রোগ। ইংরেজি Typhoid.

কামরা — কক্ষ।
লক্কর — ব্যবহারের অযোগ্য এমন পুরোনো জিনিস।
ঠাসা — বেশি বোঝাই করা। গাদাগাদি করে রাখা।
ডেগচি — রান্নার পাত্র।
বাসনকোসন — রান্নার বিভিন্ন সামগ্রী।
জঞ্জাল — আবর্জনা।
কেরোসিনের স্টোভ — একধরনের চুলা, যাতে জ্বালানি হিসেবে কেরোসিন ব্যবহার করা হয়।
চটি — চামড়ার তৈরি পাতলা জুতা বা স্যান্ডেল।
ক্রমাগত — একের পর এক।
হাতুড়ি — লোহার তৈরি যন্ত্রবিশেষ, যা পেরেক ঠোকার কাজে ব্যবহৃত হয়।
মেঘগর্জন — মেঘের ডাক।
তালিম — শিক্ষা, উপদেশ। এখানে হুকুম বা উপদেশ পালন করার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে
বিশ্রী — অসুন্দর।
বেজার — বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট।
স্তম্ভিত — বিস্ময়ে হতবাক হওয়া।
গম্ভীর গলায় — কণ্ঠ শুনতে ভারী মনে হওয়া।
সোনার মোহর — সোনার তৈরি মুদ্রা।
মশারি খাটিয়ে — মশারির উপরের চারদিক আটকানো।
কায়দা — কৌশল।
মুগ্ধ — খুশিতে মোহিত হওয়া।
অদ্ভুত মানুষ — দেখতে স্বাভাবিক মানুষের মতো নয় এমন।
রূপকথা — এক ধরনের অসম্ভব কাল্পনিক কাহিনি।
দীর্ঘ নিঃশ্বাস — বড়ো কোনো কষ্ট পেয়ে গভীরভাবে ও শব্দ করে শ্বাস ত্যাগ করা।
পরশপাথর — কাল্পনিক একধরনের পাথর, যা দিয়ে স্পর্শ করলে যেকোনো ধাতব পদার্থ বা বস্তু স্বর্ণে পরিণত হয়।
পায়রা — কবুতর।
অসম্ভব মসৃণ — খুবই কোমল বা নরম।
হলুদরঙের আভায় — দেখতে হলুদের মতো আলোর রং।
কুড়ি — বিশ।
লোভী — যে বেশি চায়।
নির্লোভ — লোভ নেই এমন ব্যক্তি। যার কোনো চাওয়া নেই। লোভহীন।
অচৈতন্য — জ্ঞান বা চেতনা হারানো। অচেতন, সংজ্ঞাহীন।

আষাঢ়ের এক রাতে

হালিমা খাতুন

একবার দাদার সঙ্গে মাছ ধরতে গিয়ে আবু বিশাল একটা বোয়াল মাছ ধরেছিল। তখন ছিল আষাঢ় মাস। ঝরঝর বৃষ্টি পড়ছিল থেকে থেকে। আর বিদ্যুতের ঝলক আকাশের ওপরে সোনার দাগ কেটে পালিয়ে যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। যাবার সময় মেঘের আড়াল থেকে তবলার শব্দ শুনিয়ে দিচ্ছিল। আবুর যে বয়স, তাতে তার ঘন বর্ষার রাতে মৌরিবিলে মাছ ধরতে যাবার কথা নয়। কারণ বয়স তার মোটে দশ। বড়ো ভাইয়েরা তাকে কোনো সময় সঙ্গে নিতে চায় না। বোয়াল মাছ ধরার দিনও দাদা সাজেদ ও তার বন্ধুরা একেবারেই জানতে পারেনি যে ছোট্ট আবু তাদের সঙ্গে যাচ্ছে। বলে-কয়ে যেতে চাইলে দাদারা ওকে সঙ্গে নেবে না। তাই বেচারা আবু চুপিচুপি গিয়ে নৌকার খোলের মধ্যে ঢুকে লুকিয়ে ছিল এবং সেখানে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

বর্ষাকাল মানে আষাঢ় এলেই মৌরিবিলে প্রচুর মাছ পড়ে। বোয়াল, পাঙ্গাস থেকে শুরু করে ট্যাংরা, পুঁটি, পারশে, বেলে সবই পাওয়া যেত। আবুর বড়ো ভাই সাজেদের মাছ ধরার নেশা খুব। অনেকবার সে বড়ো বড়ো মাছ ধরেছে। এবারও দুই বন্ধু বিপুল আর বায়েজিদকে নিয়ে সে মাছ ধরার প্ল্যান করেছিল। তারপর সব গোছগাছ করে বাড়ির নৌকাটা নিয়ে মৌরিবিলের পথে রওনা হলো। সঙ্গে নিল কয়েক রকম জাল, হারিকেন, মাছ আনার বড়ো বড়ো 'খালুই'। আর নিল রাতের খাবার। নৌকা বাইবে কিষান তিনু। দরকার হলে এরাও হাত লাগাবে। অতিরিক্ত দুটো বৈঠাও সঙ্গে করে নিল তারা।

ওদিকে আবু ছটফট করছে কী করে সে ওদের সঙ্গে যাবে। বিপুল ও বায়েজিদকে নিয়ে সাজেদ যখন নৌকায় মৌরিবিলে যাবার পাকাপাকি প্ল্যান করছিল, তখন আবু শুনে মনে মনে ঠিক করে ফেলল যে সে ওদের সঙ্গে যাবে। তাতে যা হয় হবে। আবুর এই গোপন প্ল্যান সাজেদরা কিছুই জানতে পারেনি। আকাশে মেঘ। তাই তারা সন্ধ্যার আগেই বেরিয়ে পড়ল। মাছ ধরা হবে রাতে। হারিকেনের আলো দেখলে মাছেরা কেমন যেন রাতকানা হয়ে যায়। তখন মাছশিকারিরা জাল দিয়ে ধরে ফেলে সেই পথভোলা মাছগুলোকে।

কিছুদূর যাবার পর ঝরঝর করে বৃষ্টি নামল। ওরা তিনজন ছাতা মাথায় দিল। মাথাল মাথায় তিনু নৌকার হাল ধরে বসে রইল। সন্ধ্যা হলো। বৃষ্টি থামল। হারিকেন জ্বালাল ওরা। একটু পরেই হারিকেন নিবুনিবু হয়ে এল। সাজেদ হারিকেনটা নাড়িয়ে দেখে তেল নেই একটুও তাতে। নৌকার খোলের মধ্যে কেরোসিন তেলের বোতল। পাটাতনের তক্তা তুলে দেখে সেখানে ছোটো মতো কে যেন শুয়ে আছে। সাজেদ চেঁচিয়ে উঠল—

: এই বিপুল। এই বায়েজিদ। দ্যাখ এখানে কে যেন শুয়ে আছে।

: কে আবার নৌকার খোলের মধ্যে শুতে যাবে। বোধহয় ধানের বস্তা। কিষানেরা নামাতে ভুলে গেছে।

'না, বস্তা না। এই কে তুই? কে? কে?'— বলে সাজেদ শোয়া ব্যক্তিকে ঠেলা দিল।

আবু তখন হুড়মুড় করে উঠে বসে চোখ ডলতে ডলতে বলল, 'আমি আবু।' বলেই সে কেঁদে দিল। সাজেদ বিস্মিত হয়ে বলল, 'আবু তুই এখানে কী করে এলি? আজ তোকে পিটিয়ে ঠান্ডা করব। কাউকে না-বলে চলে এসেছিস। বাড়িতে সবাই তো কান্নাকাটি শুরু করেছে। তাহলে তো মাছ ধরা যাবে না। বাড়ি ফিরে যেতে হবে।'

আবু তখন কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'দাদা মেরো না আমাকে। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে তোমাদের সাথে এসেছি মাছ ধরার জন্য। তবে কালুকে বলে এসেছি কেউ খুঁজলে বলে দিতে।'

: ভালো কথা। বুদ্ধির কাজ করেছিস। তা পুঁচকে ছেলে তুই কী মাছ ধরবি?

: বড়ো মাছ ধরব দাদা।

: বেশ থাক। বড়ো মাছ তোকেই ধরে না নিয়ে যায় দেখিস। দাদার আশ্বাস পেয়ে আবু মনের সুখে গান ধরল। সাজেদ শুনে বলল, 'তুই বরং পাটাতনের নিচে তোর জায়গায় গিয়ে ঘুমিয়ে থাক। মাছ এসে তোকে ডেকে তুলবে।'

: না আমি ঘুমাব না। বড়ো মাছ ধরব। তোমরা মাছ ধরবে আর আমি ঘুমিয়ে থাকব, তা হবে না! তা হবে না!

: তা তুই মাছ কী দিয়ে ধরবি?

: আমি বড়শি আর টোপ নিয়ে এসেছি।

আবু তখন তার পুঁটলি থেকে বড়শি আর টোপ বের করে দেখাল। তা দেখে সাজেদ ও তার বন্ধুরা হেসেই গড়াগড়ি। এমন অদ্ভুত বড়শি আর টোপ তারা কখনও দেখেনি। সাজেদ বলল—

: ও, এই তোর বড়শি, কেরোসিনের টিনের আংটা দিয়ে বানানো! এ দিয়ে মাছ কেন কুমিরও ধরতে পারবি। জলহস্তী তো আমাদের দেশে নেই। থাকলে তা-ও তোর এই বড়শি দিয়ে ধরতে পারতিস। তা দেখি তোর টোপ। ও, তেলাপোকা। মাছ কি তেলাপোকা খায়?

: খায় খায়, আমি জানি।

: ঠিক আছে তুই নৌকায় বসে কুমির, জলহস্তী যা খুশি ধর। আমরা পানিতে নেমে জাল ফেলব। দেখিস ঘুমিয়ে পড়িস না যেন। আর তিনু ভাই তুমি ওকে দেখ। আমরা চললাম। দেরি হয়ে গেল অনেক। আর দেরি করলে মাছ পাওয়া যাবে না। তোর জন্য খালি খালি সময় নষ্ট হলো। বলেকয়ে এলে কী হতো?

আবু কোনো জবাব না-দিয়ে চুপ করে রইল। একা নৌকায় থাকতে পেরে আবুর খুব আনন্দ হলো। সে তাড়াতাড়ি মাছ ধরার সরঞ্জাম বের করল। তার দুটো বড়শিতে তেলাপোকার টোপ গেঁথে পানিতে ছুড়ে দিল। তারপর বড়শির দড়ি নৌকার গলুইয়ের সঙ্গে জড়িয়ে বেঁধে বসে রইল। অন্ধকার চারদিক। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

আবুর মনে খালি একটাই ভয়। বড়শিতে মাছ ধরা পড়বে কি না। এত কষ্ট করে লুকিয়ে এসে যদি মাছ না-পায় তাহলে তো সবাই খেপাবে। বড়শির দড়ির সঙ্গে কয়েকটা জোনাকি পলিথিনের থলের মধ্যে ভরে ফাতনার মতো বেঁধে দিয়েছিল। সেই জোনাকি ফাতনার দিকে সে চেয়ে বসে ছিল। সুবোধ কাকার কাছে সে শুনেছিল যে বোয়াল মাছ তেলাপোকা ভালোবাসে। তাই সে তেলাপোকার টোপ দিয়ে পাঁচটা চিতল মাছ ধরেছিল। সে অবশ্য অনেকদিন আগের কথা। আবু ভাবতে লাগল মাছের কথা। এমন সময় সে দেখল, ফাতনাটা শাঁ করে পানির মধ্যে ডুবে গেল। সে তাড়াতাড়ি গলুইয়ের সঙ্গে বাঁধা বড়শির দড়ি ছাড়তে লাগল। ছাড়তে ছাড়তে দড়ি প্রায় শেষ হয়ে গেল। তারপর সে দড়ি টেনে টেনে আবার গলুইয়ের সঙ্গে জড়াতে লাগল। প্রথমে দড়িতে ভার লাগল না। তার মনটাই দমে গেল। কিন্তু একটু পরেই দড়িতে ভার বোধ হতে লাগল আর খুব টানাটানি শুরু হয়ে গেল। এমন সময় বৃষ্টি নামল।

তিনু হাল ধরে বসে ছিল। আবু তিনুকে প্রাণপণে ডাকতে লাগল, তিনু ভাই তিনু ভাই। বড়ো মাছ, শিগগির আস। তিনু বলল—

: ধুর পাগল। এই বিলে বড়ো মাছ কোথা থেকে আসবে। খাল, বিল তো এখন মরেই গেছে। আগের দিন হলে কথা ছিল।

: না বড়ো মাছ ধরেছি। তুমি এসো তিনু ভাই। আমার হাত কেটে যাচ্ছে।

তিনু তখন এগিয়ে এসে বড়শির দড়ি ধরল। তারা দুজনে ধরে দড়ি জড়াতে লাগল হালের খুঁটির সঙ্গে। জড়াতে জড়াতে ওরা দুজন একদম ক্লান্ত হয়ে গেল। বৃষ্টি তখনও ঝরছে। ওরা ভিজে একাকার। কিন্তু সেদিকে খেয়াল না-করে ওরা বড়শির দড়ি টেনে যেতে লাগল। টানতে টানতে শেষে একটা হ্যাঁচকা টান দিতে বড়ো কী যেন একটা নৌকার খোলের মধ্যে দড়াম করে এসে পড়ল। আর এলোপাথাড়ি লাফালাফি করতে লাগল।

তাতে নৌকা প্রায় ডুবে যাবার মতো হলো। জোরে বিদ্যুৎ চমকাল। ওরা সেই আলোতেই দেখল, বড়ো আকারের একটা বোয়াল মাছ, প্রায় আবুর সমান। বোয়াল লাফাতে লাগল। তিনু তখন খোলের তলা থেকে একটা বস্তা এনে বোয়ালের গায়ে চাপা দিল। খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তি করে বোয়াল শান্ত হলো। আবুর খুশির নাচ তখন কে দেখে!

এমন সময় সাজেদরা ফিরে এল। আজ তাদের জালে পুঁটি ছাড়া কিছুই ধরা পড়েনি। তাই রাগ করে তারা তাড়াতাড়ি চলে এসেছে। এসেই দেখে, আবুর বিশাল বোয়াল। দেখে তাদের বিশ্বাস হতে চায় না। সাজেদ বলল, 'এই আবু, অত বড়ো বোয়াল কোথা থেকে এল?' আবু বলল, 'পানি থেকে। আর আমি ধরেছি!'

লেখক-পরিচিতি

হালিমা খাতুনের জন্ম ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে বাগেরহাটে। তিনি ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন এবং নেতৃত্বও দেন। এ কারণে তাঁকে পরে ভাষাসৈনিক উপাধি দেওয়া হয়। হালিমা খাতুন শিশুদের জন্য বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর লেখা বইয়ের সংখ্যা ৩০টির বেশি। 'পিকনিকে', 'স্কুল পালিয়ে', 'ছাগল ছানার গল্প', 'কুমিরের বাপের শ্রাদ্ধ' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান এবং ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে একুশে পদকে ভূষিত হন। হালিমা খাতুন ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

দশ বছরের ছেলে আবুর খুব ইচ্ছে বর্ষার বৃষ্টিঝরা রাতে বড়ো ভাইদের সঙ্গে বিলে মাছ ধরতে যাবে। কিন্তু ছোটো বলে তারা আবুকে সঙ্গে নিতে চায় না। তাই মাছ ধরতে যাওয়ার দিন আবু আগেই নৌকার খোলে লুকিয়ে রইল। একপর্যায়ে আবু ধরা পড়লেও তাকে শেষপর্যন্ত সঙ্গে নেওয়া হয়। দেখা যায়, সে মাছ ধরার জন্য অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে তেলাপোকাও নিয়ে এসেছে। এ নিয়ে বড়োরা বেশ হাসি-তামাশা করে। বিলে গিয়ে আবুকে নৌকায় রেখে সবাই মাছ ধরতে চলে গেলে সে বড়শি ফেলে অপেক্ষা করতে থাকে। অবশেষে নানা কৌশলে আবু বড়ো একটা মাছ ধরে ফেলে। বড়ো ভাইয়েরা অবশ্য সে-রাতে পুঁটিমাছ ছাড়া আর কোনো মাছই ধরতে পারেনি। তারা নৌকায় বিশাল আকৃতির বোয়াল মাছ দেখে অবাক হয়ে যায়।
বয়সে ছোটো বলে কাউকে অবহেলা করতে নেই, কিংবা বয়সে বড়ো হলেই কোনো কাজে কেউ সফলতা লাভ করবে, তাও নয়– গল্পটিতে এই সত্য ধরা পড়েছে।

শব্দার্থ ও টীকা

দাদা — বড়ো ভাই।
বিদ্যুতের ঝলক — বিজলি চমকাবার সময় যে তীব্র আলো তৈরি হয়।
তবলা — একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র।
নৌকার খোল — নৌকায় অবস্থিত পাটাতনের নিচের লম্বা ফাঁকা জায়গা।
প্ল্যান — পরিকল্পনা। ইংরেজি Plan.
গোছগাছ — সাজানো।
হারিকেন — কাচ দিয়ে ঘেরা লণ্ঠন। ইংরেজি Hurricane.
খালুই — বাঁশের তৈরি ছোটো ঝুড়ি।
কিষান — কৃষাণ, চাষি।

বৈঠা	— নৌকা চালানোর জন্য হাতলযুক্ত কাঠ।
পাকাপাকি	— নির্ধারিত।
রাতকানা	— রাতে যে ভালো দেখতে পায় না।
মাথাল	— বাঁশ ও বেতের তৈরি টুপি।
হাল	— নৌকা ঘোরানোর জন্য বিশেষ বৈঠা।
পাটাতন	— কাঠের ফালি দিয়ে তৈরি নৌকার মেঝে।
পুঁচকে	— অত্যন্ত ছোটো।
মাদল	— ঢোলের মতো বাদ্যযন্ত্র।
বড়শি	— লোহার বাঁকা ও আলযুক্ত, কাঁটা যাতে মাছের খাদ্য বা টোপ লাগিয়ে পানিতে ফেলে রাখা হয়।
টোপ	— বড়শিতে গেঁথে দেওয়া মাছের খাদ্য, যা খেতে গিয়ে মাছ বড়শিতে ধরা পড়ে।
গলুই	— নৌকার দুই প্রান্তের সরু অংশ।
জোনাকি	— একধরনের ছোটো পোকা, অন্ধকারে যার শরীরে আলো জ্বলে ও নেভে।
ফাতনা	— মাছ ধরার জন্য বড়শির সুতায় বাঁধা ভাসমান কাঠি বা শোলা।
দড়াম	— ভারি ও শক্ত জিনিস পড়ার শব্দ।
এলোপাথাড়ি	— এলোমেলো, বিশৃঙ্খল।
বস্তা	— বড়ো থলে।
ধস্তাধস্তি	— পরস্পর বলপ্রয়োগ, টানাটানি।

মামার বিয়ের বরযাত্রী

খান মোহাম্মদ ফারাবী

মেজো মামার বিয়ে। ছোটো মামা আর মেজোমামা তাই এসেছেন দাওয়াত দিতে। বাড়ির সবাই বিয়ের তিন দিন আগে মামাবাড়ি যাবে। শুধু আমিই যেতে পারব না। কারণ, আমার পরীক্ষা। হ্যাঁ, মামার যেদিন বিয়ে ঠিক, তার আগের দিনই আমার পরীক্ষা শেষ হবে।

মেজোমামা পরদিনই চলে গেলেন। শুধু ছোটোমামা রইলেন। তিনি বিয়ের তিন দিন আগে সবাইকে (অবশ্য আমি বাদে) নিয়ে যাবেন।

সেদিন খাওয়ার পর ছোটোমামার সঙ্গে গল্প করছিলাম।

আমি বলছিলাম, 'মেজোমামার বিয়েতে আর যাওয়া হলো না। ইশ! কত দিন ধরে বিরিয়ানি খাইনি। এরকম চান্সটা মিস হয়ে গেল।'

ছোটোমামা খানিক চিন্তা করে বললেন, 'তুই কিন্তু যেতে পারিস।'

আমি উৎসাহিত হয়ে উঠলাম, 'কীভাবে?'

: তোর পরীক্ষা তো শেষ হবে ষোলো তারিখ, আর বিয়ে হলো গিয়ে সতেরো তারিখ। সুতরাং...

: তুমি তো বলতে চাও যে, আমার পরীক্ষা ষোলো তারিখ শেষ হবে, তাহলে তো সতেরো তারিখে সহজেই যাওয়া যায় মামাবাড়ি। তুমি মনে করেছ এ কথাটা আমি ভেবে দেখিনি, কিন্তু তিনটের পরে তো আর ট্রেন নেই। মানে পরীক্ষা তো শেষ হবে সেই পাঁচটায়। কিন্তু তখন তো আর মামাবাড়ির কোনো ট্রেন পাব না। রাত্রিতে সেদিনের কোনো ট্রেনই নেই। দিনে মাত্র সাড়ে বারোটা আর তিনটায় দুটো ট্রেনই আছে। সুতরাং ষোলো তারিখেই পরীক্ষা দিয়ে মামার বাড়ি যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যেতে হলে সেই পরের দিন। মানে সতেরো তারিখে সাড়ে বারোটার ট্রেনে যেতে হবে। সেই ট্রেন গিয়ে পৌঁছবে সন্ধ্যা সাতটায়। তাহলে আর গিয়ে লাভ কী, কারণ ততক্ষণে তো মামা বরযাত্রীসহ বিয়েতে রওনা হয়ে যাবেন। যদি মামার সঙ্গে বরযাত্রী হয়ে যেতে না-ই পারলাম, তবে আর গিয়ে লাভটা কী শুনি?

: উঁহু, আমি তা বলছি না।

: তবে?

: তুই যদি সোজা কনের বাড়িতে চলে যাস—

: তার মানে?

: তোর আমাদের বাড়িতে যাওয়ার আর কী দরকার? তুই সতেরো তারিখে সাড়ে বারোটার ট্রেনে সোজা কনের বাড়িতে চলে যাবি। তাহলে তুই সেখানে বরযাত্রীদের সঙ্গে মিলতে পারবি। আর তাহলে তোর বিরিয়ানিটাও মিস যায় না। কী বলিস?

আমি তো লাফিয়ে উঠলাম— থ্রি চিয়ার্স ফর ছোটোমামা। বললাম, 'মার্ভেলাস আইডিয়া।'

আনন্দে একবারে আকাশে যাওয়ার জোগাড় করছি। কিন্তু সেই মুহূর্তে ছোটোমামা যে-কথাটা বললেন, তাতে আমি আকাশে উঠতে উঠতেই ধপ করে পড়ে গেলাম। তিনি বললেন, 'কিন্তু একটা কথা কী জানিস ফোকলা?'

: কী?

: স্টেশনের নামটাই যে আমার মনে নেই।

: স্টেশনের নাম! কোন স্টেশনের?

: ওই কনের বাড়ি যেখানে সেখানকার স্টেশনের নামই ভুলে গেছি।

: অ্যাঁ, স্টেশনের নামই জানো না! তবে যাব কী করে? আমাদের বাসার কেউ জানে না?

: না বোধ হয়। শুধু মেজোভাইয়াই জানতেন। কিন্তু তিনি চলে গেছেন।

: তাহলে?

: আমি অবশ্য একটা উপায় বাতলে দিতে পারি।

: কী উপায়?
ছোটোমামা মনে মনে কী যেন একটা হিসাবে করলেন। তারপর বললেন,
: হ্যাঁ, কনের বাড়ির স্টেশন হলো ঢাকা থেকে বারোটা স্টেশনের পর। তুই যদি গুনে গুনে বারোটা স্টেশন পর নামতে পারিস, তাহলেই চলবে।
: নিশ্চয়ই পারব।
: স্টেশনে নেমে তুই একটা রিকশা নিয়ে বলবি যে, 'চৌধুরীদের বাড়িতে যাব'। ব্যস, তাহলেই চলবে। চৌধুরীরা ওখানকার নামকরা লোক। সবাই ওঁদের চেনে।
: আমি নিশ্চয়ই যেতে পারব।
মেজোমামার বিয়ের তিন দিন আগে বাড়িসুদ্ধ সবাই চলে গেল। শুধু আমিই রইলাম। যাওয়ার সময় সবাই উপদেশ দিয়ে গেল ভালো করে পরীক্ষা দিতে।

আমার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। আজ সতেরো তারিখ। আজই সাড়ে বারোটার ট্রেনে বিয়ে বাড়ি যাব। অপেক্ষা করে করে আর তর সইছে না। শেষ পর্যন্ত সাড়ে এগারোটায় বাড়ি থেকে বের হলাম। তারপর ধীরে-সুস্থে স্টেশনে উপস্থিত হলাম। ভেবেছিলাম গাড়ি ছাড়তে এখনও দেরি। ওমা! গিয়ে দেখি,গাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে। লাফ দিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠলাম। আমি যে কামরাতে উঠলাম, সে কামরায় অবশ্য ভিড় বেশি নেই। একজন ভদ্রলোক আমাকে বললেন, 'এই যে এখানে বসো খোকা, এখানে বসো।'
আমি তাঁর পাশেই বসে পড়লাম। হঠাৎ তাঁর ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই আশ্চর্য হলাম, আরে এ যে মোটে বারোটা বাজে! গাড়ি ছাড়ার কথা তো সাড়ে বারোটায়! আমি একটু আমতা আমতা করে বললাম, 'আপনার ঘড়িটা কি— বন্ধ, মানে বলছিলাম কি আপনার ঘড়িটা ঠিকমতো চলছে তো?'
: কী বললে?
: আজ্ঞে আপনার ঘড়িটার কথা বলছিলাম।
: ঘড়িটার কথা? তা আমার ঘড়িটা যেই দেখে সেই কিছু না বলে পারে না। আমার ছেলে মিউনিখে থাকে কিনা, তাই সেখান থেকেই ঘড়িটা পাঠিয়েছে। খুব ভালো ঘড়ি। যে দেখে সে-ই প্রশংসা করে। ঘড়িটা তোমার কাছে ভালো লেগেছে নাকি? চেনটা দেখছ তো! কী সুন্দর! এখানে এসব জিনিস টাকা ছাড়লেও পাবে না।
: আজ্ঞে আমি সে কথা বলছি না।
: তবে কী বলছিলে?
: মানে আপনার ঘড়িটা ঠিকমতো টাইম দেয় তো!
: হুঁ, হুঁ, হাসালে দেখছি। এ ঘড়ি যদি ঠিকমতো টাইম না-দেয় তবে কোন ঘড়িতে ঠিকমতো টাইম পাওয়া যাবে বলতে পারো?
: তা তো বটেই, তা তো বটেই।
: তবে?
: আপনার ঘড়ি তো ঠিকমতো টাইম দেবেই, নিশ্চয়ই দেবে, দেওয়া তো উচিত। তবে ঘড়িটা যদি মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যায়, কী বলে, সেটা যদি না চলে, কিংবা বলতে পারেন আপনি যদি ঘড়িটা না চালান—

: আমি ঘড়ি চালাতে যাব কেন? ঘড়িটা নিশ্চয়ই ঘোড়া নয়, তাহলে ঘড়ি চালানোর প্রশ্নই ওঠে না। ঘোড়ার পিঠে না-হয় বসা যায়, কিন্তু ঘড়িটা তো আমার পিঠেই, থুরি আমার হাতেই অবস্থান করে। আর এখন তো ঘোড়ার চেয়ে মোটর চালনাই ভালো, কিংবা ঘোড়ার বিকল্প বাইকেও চাপতে পারো।

: আজ্ঞে আমি বাইকে চাপতেও পারি না, আর ওসবে চড়ার ইচ্ছাও নেই। আর ঘোড়াকে তো মোটেই পছন্দ করি না। আমার মনে হয়, ঘোড়াও আমাকে নিশ্চয়ই পছন্দ করে না। কারণ,একবার ঘোড়ার পিঠে চাপতে গিয়ে ঘোড়াও এরকম রেগে গিয়েছিল যে আমার মনে হলো ওর পিঠে চড়াটাই ঘোড়া বোধ হয় পছন্দ করল না। আর তার ফলে রেগে গিয়েও যে ব্যাপার ঘটাল তাতে আমার সাড়ে তেত্রিশ ঘণ্টা বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল। তাই বুঝতেই পারছেন ওসব ঘোড়া-টোড়া চড়া আমি মোটেও পছন্দ করি না।

: তা বাপু তুমি যেটায় চড়তে পছন্দ করো না সেটায় আমায় চড়তে বলছ কেন?

: কই, আমি তো আপনাকে ঘোড়ায় চড়তে কখনো বলিনি, শুধু আপনার ঘড়ির টাইমটা—

: জানতে চেয়েছিলে! তা তো দেখতেই পাচ্ছ বারোটা বেজে এই দু-তিন মিনিট।

: হ্যাঁ, তা তো দেখতেই পাচ্ছি, তবে গাড়ি তো ছাড়ে সাড়ে বারোটায়। তাই ভাবছিলাম, আপনার ঘড়িটা বোধ হয় চলছে না।

: না তো, গাড়ি তো বারোটায় ছাড়ে। আমি এ গাড়িতে প্রায়ই আসা-যাওয়া করি, আমি ভালো করেই জানি এ গাড়ি বারোটায় ছাড়ে।

আমি ভাবলাম কী জানি, ছোটো মামাই হয়তো গাড়ির টাইম বলতে ভুল করেছে। ভাগ্যিস, তাড়াতাড়ি এসেছিলাম। নইলে ট্রেনটা মিস হয়ে যেত। ভদ্রলোক আবার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তা তুমি কোথায় নামবে?'

: স্টেশনের নাম জানি না, তবে ঢাকা থেকে বারোটা স্টেশন পরে নামব।

: বারোটা স্টেশন পরে!

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মনে মনে যেন একটা হিসাব করলেন। তারপর হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, 'আরে আমি যে স্টেশনে নামছি তুমিও তাহলে সেই স্টেশনেই নামছ।' ভদ্রলোক আমাকে স্টেশনের নামটি বললেন।

এমনি সময় সে গাড়ি কোনো স্টেশনে যেন থামল। তারপরই আমাদের কামরায় চেকার এল। সবার কাছে টিকিট চেয়ে আমার কাছেও টিকিট চাইল। আমি সেই ভদ্রলোকের কাছ থেকে স্টেশনটির নাম জেনে নিয়েছিলাম। তাই আট আনা ফাইন দিয়ে চেকারের কাছ থেকে ওই স্টেশনের টিকিট করে নিলাম।

গাড়ি কিছুক্ষণ পরেই চলতে আরম্ভ করল। ভদ্রলোক আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা তুমি সেখানে কোথায় যাবে?'

: সেখানে চৌধুরী বাড়ি যাব।

: বলো কী— এ্যাঁ! আমিও তো চৌধুরীদের বাড়ির লোকই। চৌধুরী সম্পর্কে আমার মামাতো ভাই। তা চৌধুরীদের তুমি কী হও?

: আজ্ঞে আমি অবশ্য কিছু হই না। তবে আমার মামার সঙ্গে আজ চৌধুরী সাহেবের মেয়ের বিয়ে। তাই সেখানে চলেছি।

: কিন্তু বিয়ে তো আজ নয়।

: আজ নয়?

: না। আজ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তারিখ বদলে দেওয়া হয়েছে। কাল বিয়ে হবে। তুমি কি একাই এসেছ?

: হ্যাঁ, আমি একাই এসেছি। আজ বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। তাই আমি সোজা ঢাকা থেকে কনেপক্ষের বাড়ি যাচ্ছি, কথা ছিল সেখানেই বরপক্ষের সঙ্গে মিলিত হব।

: তা ভালোই করেছ, একদিন আগে এসে জায়গাটা ভালো করে দেখে-টেখে যেতে পারবে।

আমি একটু আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, 'দেখার কোনো জিনিস আছে?'

: তা থাকবে না কেন? মাইল তিনেক ভিতরে গেলেই পদ্মবিল। বিরাট বিল। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি আছে সেখানে। যত ইচ্ছে শিকার করতে পারো। শহরের পশ্চিমে বিরাট মাঠ। সেখানে ছেলেরা খেলাধুলা করে। তারপর ওদিকে আবার একটু জঙ্গলের মতো আছে। আগে অবশ্য ঘন জঙ্গলই ছিল। তবে এখন সেই জঙ্গল আর নেই। পাতলা দু-একটা ঝোপঝাড় যা আছে। এখন ছেলেরা ওখানে পিকনিক করতে যায়। তারপর উত্তর দিকে...

আমি আর কিছু বললাম না। সন্ধ্যার দিকেই গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গেলাম। ভদ্রলোক আমাকে নিয়ে চৌধুরীদের বাড়িতে গেলেন। আমি বৈঠকখানায় বসলাম। তিনি ভিতরে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আরও একজন ভদ্রলোক (মনে হয় ইনিই সেই চৌধুরী সাহেব) ও আমার সমবয়সি কয়েকটি ছেলে সেখানে এল। সেই ভদ্রলোক আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'বুঝলে হে চৌধুরী, এই হলো তোমার জামাইয়ের ভাগনে।'

চৌধুরী সাহেব আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'তা খোকা তুমি এখানে বসে রয়েছ কেন? ভিতরে এসো, ভিতরে এসো।'

ভদ্রলোক আমাকে নিয়ে ভিতরে গেলেন। তারপর চৌধুরী সাহেব হেঁকে বললেন, 'কই তোমরা সব গেলে কোথায়? দেখে যাও কে এসেছে।'

কিছুক্ষণ পরেই একজন ভদ্রমহিলা সেখানে এলেন। চৌধুরী সাহেব বললেন, 'আরে দেখেছ, আমাদের জামাইয়ের ভাগনে।'

: বলো কী?

তারপর ভদ্রমহিলা আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'তা ভাই তোমার আসতে তো কষ্ট হয়নি?'

: জ্বি না।

আমি একেবারে বিনয়ে বিগলিত।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'ওমা, তোমরা ওকে এখনও কিছু খেতে দাওনি? এসো, এসো!' বলে তিনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চললেন। তারপর যা ভূরিভোজন হলো। বিয়ের খাওয়াকে যা হার মানায়।

যাক, সে রাত্রি ভালোভাবেই কাটল। পরদিন সকালে নয়টার দিকে দুটি ছেলে এল। এ বাড়িরই ছেলে। একজনের নাম বুলু, অপরজনের নাম টুলু। তারা আমাকে এসে বলল, 'চলো আজ পদ্মবিলে শিকার করতে যাই।'

আমি আঁতকে উঠলাম। বলে কী! আমি যাব শিকার করতে! তাহলেই সেরেছে। শিকারে যাওয়ার ব্যাপারটাকে আমি তাই সরাসরি অস্বীকার করলাম। কিন্তু ছেলে দুটোও নাছোড়বান্দা। তারা আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেই। আমি যতই অস্বীকার করি, তারাও ততই শিকারে নিয়ে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে। আমি যুক্তি দিয়ে বুঝাই, 'শিকার জিনিসটা ভালো নয়, খামাখা কয়েকটি প্রাণীহত্যা।'

ওদের কাছে হার মানতেই হলো।

বিরাট পদ্মবিল, স্থানে স্থানে শাপলা রয়েছে। অবশ্য পদ্মফুলের নামগন্ধও দেখলাম না কোনোখানে। সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে আসছে। শিকার করার জায়গাই বটে!

বুলু-টুলুরাই শিকার করছে। কিন্তু ওরা যে হঠাৎ আমাকেই পাকড়াও করে বসবে তা কে জানত। ওরা চার-পাঁচটা বক মারার পর আমার হাতে বন্দুক দিয়ে বলল, 'তুমি একটা শুট করো!'

আমি কী করে বলি যে, বন্দুক ছুড়তে জানি না। কিন্তু ওরাও আমাকে ছাড়বে না। বলে, 'শিকারে এসে যদি একটাও শুট না করো তবে এলে কী জন্যে?'

বাধ্য হয়েই আমাকে বন্দুক হাতে নিতে হলো। হাত কাঁপতে লাগল। ট্রিগারে টিপ দিলাম। আমার সামনেই বাঁ পাশে কিছু দূরে মোটরকারটা দাঁড় করানো ছিল। আমার গুলি ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মোটরের পিছনের চাকাটা সশব্দে ফেটে গেল। বুল-টুলু দৌড়ে গেল গাড়ির কাছে। তারপর গাড়ির পিছন থেকে বাড়তি চাকাটা এনে অনেক কসরত করে লাগাল। অবশেষে বাড়ি ফিরলাম।

আজ বিয়ের দিন। তাই বাড়ি সরগরম। কোনোমতে দিনটা কেটে সন্ধ্যা হলো। বর আসার অপেক্ষায় আমরা সবাই বসে রয়েছি। এমন সময় রব উঠল, 'বর এসেছে, বর এসেছে।' কিছুক্ষণের মধ্যেই বরযাত্রীসহ বর এলেন। আমি আনন্দিত হয়ে মামার কাছে গেলাম। কিন্তু কোথায় মামা! বর তো আমার মেজোমামা নয়। এদিকে চৌধুরী সাহেব এসে বরকে বললেন, 'এই যে বাবাজি, তোমার ভাগনে কালই এখানে এসে গিয়েছে।' বর আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'ও তো আমার ভাগনে নয়। আর একে তো আমি চিনিই না।'

: এঁ্যা, বলো কী?

চৌধুরী সাহেব হতভম্ব। আশেপাশে যে ছেলেরা ছিল তারা খেপে উঠল।

চৌধুরী সাহেব তাদের থামালেন। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'তুমি কি তাহলে মিথ্যে বলেছ?'

আমি বললাম, 'জ্বি না, আমি তো ব্যাপার কিছুই বুঝছি না। আমার মামা তো এখানেই আসতে বলে দিয়েছিলেন।'

চৌধুরী সাহেব বললেন, 'ঠিক আছে তুমি আজ এখানে থাকো। তোমার মামার বাড়িতেই টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছি। সেখান থেকে কোনো লোক এসে তোমাকে নিয়ে যাবে। তোমার মামার বাড়ির ঠিকানা কী?'

আমি ঠিকানা বললাম। তিনি টেলিগ্রাম করতে লোক পাঠালেন।

রাতটা নির্বিঘ্নেই কাটল। পরদিন ছোটোমামা এসে হাজির। তিনি টেলিগ্রাম পেয়ে ছুটে এসেছেন। এদিকে চৌধুরী সাহেব এবং ওই ভদ্রলোকও এসেছেন। ছোটোমামার সঙ্গে তাঁরা অনেকক্ষণ আলাপ করার পরই ব্যাপারটা খোলাসা হয়ে গেল।

আসলে ব্যাপারটা হয়েছে এরকম :
ছোটোমামা আমাকে হিসাব করে বলেছিলেন বারোটি স্টেশন পরে নামতে। তিনি আমাকে চিটাগাং লাইনের গাড়িতে চড়েই বারোটা স্টেশন পরে নামতে বলেছিলেন; কিন্তু আমি ভুলে ময়মনসিংহ লাইনে এসে পড়েছি। কারণ ছোটোমামা আমাকে সাড়ে বারোটার ট্রেনে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু বারোটার সময় ময়মনসিংহ লাইনের একটা গাড়ি ছিল। আমি যখন স্টেশনে আসি, তখন ওই ময়মনসিংহের গাড়িটাই ছাড়ছিল। আর ভুল করে আমি তাতেই উঠে পড়েছিলাম। তারপর ময়মনসিংহ লাইনেই বারোটা স্টেশন পরে নেমে পড়লাম। ভাগ্যক্রমে সেখানেও চৌধুরী সাহেব নামে একজন লোক ছিলেন এবং তাঁরও মেয়ের বিয়ে আমার মেজোমামার বিয়ের পরদিনই ঠিক হয়েছিল। তাই ভুল করে আমি এটাকেই আমার মেজোমামার শ্বশুরবাড়ি মনে করেছিলাম!

ব্যাপারটা খোলাসা হতেই সবাই আমরা হো হো করে হেসে উঠলাম। ছোটোমামা চৌধুরী সাহেবকে বললেন, 'এ যে দেখি রীতিমতো একটা অ্যাডভেঞ্চার। বারোটার ট্রেনটাই যত গণ্ডগোলের মূল'— বলেই আবার সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন।

লেখক-পরিচিতি

খান মোহাম্মদ ফারাবী ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। সৃষ্টিশীল মেধাবী এই লেখক ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে পড়া অবস্থাতেই অনেক শিশুতোষ গল্প লেখেন। 'মামার বিয়ের বরযাত্রী' তাঁর অষ্টম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালীন রচনা। তাঁর রচিত কাব্য 'কবিতা ও অন্যান্য', প্রবন্ধের বই 'এক ও অনেক'; গল্পগ্রন্থ 'মামার বিয়ের বরযাত্রী' এবং নাটক 'আকাশের ওপারে আকাশ'। ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে খান মোহাম্মদ ফারাবীর অকালমৃত্যু হয়।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা থাকায় মেজোমামার বিয়ের অনুষ্ঠানে পরিবারের সঙ্গে যেতে পারেনি গল্পের কিশোর ছেলেটি। তবে ছোটোমামার পরামর্শে সে পরীক্ষা শেষ করেই সরাসরি বিয়ের আসরে উপস্থিত হওয়ার পরিকল্পনা করে। দুপুর সাড়ে বারোটায় ছেড়ে-যাওয়া ট্রেনে করে বারোটা স্টেশন পরে নামলেই খুঁজে পাওয়া যাবে মামার হবু শ্বশুর চৌধুরী সাহেবের বাড়ি। স্টেশনে তাড়াহুড়ায় সে উঠে পড়ে ভুল ট্রেনে। সেখানে এক যাত্রীর সহযোগিতায় কাকতালীয়ভাবে আরেক চৌধুরীদের বিয়েবাড়িতে উপস্থিত হয়। বিয়ে বাড়িতে বরের ভাগনে হিসেবে কিশোরটি খুব সমাদর লাভ করে; কিন্তু বিয়ের অনুষ্ঠানে বর তাকে চিনতে না পারলে সৃষ্টি হয় বিব্রতকর পরিস্থিতির।
ঝোঁকের বশে কোনো কাজ করে ফেললে দুর্গতি পোহাতে হয়। এ গল্পে হাস্যরসের মাধ্যমে তা-ই দেখানো হয়েছে।

শব্দার্থ ও টীকা

বরযাত্রী	— বিয়েতে বরের সঙ্গী।
মিস	— সুযোগ না-পাওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইংরেজি miss.
থ্রি চিয়ার্স	— আনন্দ প্রকাশক শব্দ। ইংরেজি three chears.
মার্ভেলাস আইডিয়া	— অপূর্ব চিন্তা। ইংরেজি marvelous idea.
বাতলে	— উপায় বলা।
মিউনিখ	— জার্মানির একটি শহরের নাম।
টাইম	— সময়। ইংরেজি time.
থুরি	— 'ভুল হয়েছে' বোঝানোর জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়।
চাপতে	— চড়তে।
উৎফুল্ল	— হাসিখুশি।
চেকার	— টিকিট পরীক্ষক। ইংরেজি checker.
বিগলিত	— গলে গেছে এমন।
পদ্মবিল	— বৃহৎ জলাশয় বিশেষ। যেখানে প্রচুর পদ্মফুল ফোটে।
ভূরিভোজন	— পেট পুরে খাওয়া।
নাছোড়বান্দা	— যে লোক সহজে ছেড়ে দেয় না বা ক্ষান্ত হয় না।
পীড়াপীড়ি	— অনুরোধ।
খামাখা	— শুধু শুধু।
পাকড়াও	— ধরো, গ্রেফতার করো।
শুট	— গুলি করা। ইংরেজি shoot.
ট্রিগার	— বন্দুকের গুলি ছোড়ার বিশেষ অংশ। ইংরেজি trigger.
কসরত	— চেষ্টা।
সরগরম	— জমজমাট, পরিপূর্ণ।
হতভম্ব	— আশ্চর্য।
টেলিগ্রাম	— তারবার্তা। ইংরেজি telegram.
নির্বিঘ্ন	— বাধাহীন।
অ্যাডভেঞ্চার	— রোমাঞ্চকর। ইংরেজি adventure.

আদুভাই

আবুল মনসুর আহমদ

এক.

আদুভাই ক্লাস সেভেনে পড়তেন। ঠিক পড়তেন না বলে পড়ে থাকতেন বলাই ভালো। কারণ, ওই বিশেষ শ্রেণি ব্যতীত আর কোনো শ্রেণিতে তিনি কখনো পড়েছেন কি না, পড়ে থাকলে ঠিক কবে পড়েছেন, সেকথা ছাত্ররা কেউ জানত না। অনেক শিক্ষকও জানতেন না বলেই বোধ হতো।

শিক্ষকের অনেকে তাঁকে 'আদুভাই' বলে ডাকতেন। কারণ নাকি এই যে, তাঁরাও এককালে আদুভাইয়ের সমপাঠী ছিলেন এবং সবাই নাকি ওই ক্লাস-সেভেনেই আদুভাইয়ের সঙ্গে পড়েছেন।

আমি যখন ক্লাস সেভেনে আদুভাইয়ের সমপাঠী হলাম, ততদিনে আদুভাই ওই শ্রেণির পুরাতন টেবিল ব্ল্যাকবোর্ডের মতোই নিতান্ত অবিচ্ছেদ্য এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক অঙ্গে পরিণত হয়ে গিয়েছেন।

আদুভাইয়ের এই অসাফল্যে আর যে-ই যত হতাশ হোক, আদুভাইকে কেউ কখনো বিষণ্ণ দেখেনি। কিংবা নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি কখনো কোনো শিক্ষক বা পরীক্ষককে অনুরোধ করেননি। যদি কখনো কোনো বন্ধু বলেছে, 'যান না আদুভাই, যে কয় সাবজেক্টে শর্ট আছে, শিক্ষকদের বলে কয়ে নম্বরটা নিন না বাড়িয়ে।' তখন গম্ভীরভাবে আদুভাই জবাব দিয়েছেন, 'সব সাবজেক্টে পাকা হয়ে ওঠাই ভালো।'

কোন কোন সাবজেক্টে শর্ট, সুতরাং পাকা হওয়ার প্রয়োজন আছে, তা কেউ জানত না। আদুভাইও জানতেন না। জানবার কোনো চেষ্টাও করেননি। জানবার আগ্রহও যে তাঁর আছে, তা-ও বোঝবার উপায় ছিল না। বরঞ্চ তিনি যেন মনে করতেন, ও-রকম আগ্রহ প্রকাশ করাই অন্যায় ও অসংগত। তিনি বলতেন, যেদিন তিনি সব সাবজেক্টে পাকা হবেন, প্রমোশন সেদিন তাঁর কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। সে শুভদিন যে একদিন আসবেই, সে বিষয়ে আদুভাইয়ের এতটুকু সন্দেহ কেউ কখনো দেখেনি।

কত খারাপ ছাত্র প্রশ্নপত্র চুরি করে, অপরের খাতা নকল করে, আদুভাইয়ের ঘাড়ের ওপর দিয়ে প্রমোশন নিয়ে চলে গিয়েছে— এ ধরনের ইংগিত আদুভাইয়ের কাছে কেউ করলে, তিনি গর্জে উঠে বলতেন, 'জ্ঞানলাভের জন্যই আমরা স্কুলে পড়ি, প্রমোশন লাভের জন্য পড়ি না।'

সেজন্য অনেক সন্দেহবাদী বন্ধু আদুভাইকে জিজ্ঞেস করেছে, 'আদুভাই, আপনার কি সত্যিই প্রমোশনের আশা আছে?'

নিশ্চিত বিজয়-গৌরবে আদুভাইয়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনি তাচ্ছিল্যভরে বলেছেন, 'আজ হোক, কাল হোক, প্রমোশন আমাকে দিতেই হবে। তবে হ্যাঁ, উন্নতি আস্তে আস্তে হওয়াই ভালো। যে গাছ লকলক করে বেড়েছে, সামান্য বাতাসেই তার ডগা ভেঙেছে।'

সেজন্য আদুভাইকে কেউ কখনো পিছনের বেঞ্চিতে বসতে দেখেনি। সামনের বেঞ্চিতে বসে তিনি শিক্ষকের প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, হাঁ করে গিলতেন, মাথা নাড়তেন ও প্রয়োজনমতো নোট করতেন। খাতার সংখ্যা ও সাইজে আদুভাই ছিলেন ক্লাসের অন্যতম ভালো ছাত্র।

শুধু ক্লাসের নয়, স্কুলের মধ্যে তিনি সবার আগে পৌঁছুতেন। এ ব্যাপারে শিক্ষক কি ছাত্র কেউ তাঁকে কোনোদিন হারাতে পেরেছে বলে শোনা যায়নি।

স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় আদুভাইকে আমরা বরাবর দুটো পুরস্কার পেতে দেখেছি। আমরা শুনেছি, আদুভাই কোন অনাদিকাল থেকে ওই দুটো পুরস্কার পেয়ে আসছেন। তার একটি, স্কুল কামাই না করার জন্য; অপরটি সচ্চরিত্রের জন্য। শহরতলির পাড়া-গাঁ থেকে রোজ-রোজ পাঁচ মাইল রাস্তা তিনি হেঁটে আসতেন বটে; কিন্তু ঝড়-তুফান, অসুখ-বিসুখ কিছুই তাঁর এ কাজে অসুবিধা সৃষ্টি করে উঠতে পারেনি। চৈত্রের কাল-বৈশেখি বা শ্রাবণের ঝড়-ঝঞ্ঝায় যেদিন পশুপক্ষীও ঘর থেকে বেরোয়নি, সেদিন ছাতার নিচে নুড়িমুড়ি হয়ে, বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে, আদুভাইকে স্কুলের পথে এগোতে দেখা গিয়েছে। মাইনের মমতায় শিক্ষকেরা অবশ্য স্কুলে আসতেন। তেমন দুর্যোগে ছাত্ররা কেউ আসেনি নিশ্চিত জেনেও নিয়ম রক্ষার জন্য তারা স্কুলে একটি উঁকি মারতেন। কিন্তু তেমন দিনেও অন্ধকার কোণ থেকে 'আদাব, স্যার' বলে যে-একটি ছাত্র শিক্ষকদের চমকে দিতেন, তিনি ছিলেন আদুভাই। আর চরিত্র? আদুভাইকে কেউ কখনো রাগ কিংবা অভদ্রতা করতে কিংবা মিছে কথা বলতে দেখেনি।

স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর প্রথম পরীক্ষাতেই আমি ফার্স্ট হলাম। সুতরাং আইনত আমি ক্লাসের মধ্যে সবচাইতে ভালো ছাত্র এবং আদুভাই সবার চাইতে খারাপ ছাত্র ছিলেন। কিন্তু কী জানি কেন, আমাদের দুজনার মধ্যে একটা বন্ধন সৃষ্টি হলো। আদুভাই প্রথম থেকে আমাকে যেন নিতান্ত আপনার লোক বলে ধরে নিলেন। আমার ওপর যেন তাঁর কতকালের দাবি।

আদুভাই মনে করতেন, তিনি কবি ও বক্তা। স্কুলের সাপ্তাহিক সভায় তিনি বক্তৃতা ও স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। তাঁর কবিতা শুনে সবাই হাসত। সে হাসিতে আদুভাই লজ্জাবোধ করতেন না, নিরুৎসাহও হতেন না। বরঞ্চ তাকে তিনি প্রশংসাসূচক হাসিই মনে করতেন। তাঁর উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে যেত।

অন্যসব ব্যাপারে আদুভাইকে বুদ্ধিমান বলেই মনে হতো। কিন্তু এই একটি ব্যাপারে তাঁর নির্বুদ্ধিতা দেখে আমি দুঃখিত হতাম। তাঁর নির্বুদ্ধিতা নিয়ে ছাত্র-শিক্ষক সবাই তামাশা করছেন, অথচ তিনি তা বুঝতে পারছেন না দেখে আমার মন আদুভাইয়ের পক্ষপাতী হয়ে উঠত।
গেল এইভাবে চার বছর। আমি ম্যাট্রিকের জন্য টেস্ট পরীক্ষা দিলাম। আদুভাই কিন্তু সেবারও যথারীতি ক্লাস সেভেনেই অবস্থান করছিলেন।

দুই.
ডিসেম্বর মাস।
সব ক্লাসের পরীক্ষা ও প্রমোশন হয়ে গিয়েছে। প্রথম বিবেচনা, দ্বিতীয় বিবেচনা, তৃতীয় বিবেচনা ও বিশেষ বিবেচনা ইত্যাদি সকল প্রকারের 'বিবেচনা' হয়ে গিয়েছে। 'বিবেচিত' প্রমোশন-প্রাপ্তের সংখ্যা অন্যান্য বারের ন্যায় সেবারও পাশ করা প্রমোশন-প্রাপ্তের সংখ্যার দ্বিগুণেরও উর্ধ্বে উঠেছে।
কিন্তু আদুভাই এসব বিবেচনার বাইরে। কাজেই তাঁর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে আমরা টিউটোরিয়েল ক্লাস করছিলাম। ছাত্ররা শুধু শুধু স্কুল-প্রাঙ্গণে জটলা করছিল— প্রমোশন পাওয়া ছেলেরা নিজেদের কীর্তি-উজ্জ্বল চেহারা দেখাবার জন্য, না-পাওয়া ছেলেরা প্রমোশনের কোনো প্রকার অতিরিক্ত বিশেষ বিবেচনায় দাবি জানাবার জন্য। এমনি দিনে একটু নিরালা জায়গায় পেয়ে হঠাৎ আদুভাই আমার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। আমি চমকে উঠলাম। আদুভাইকে আমরা সবাই মুরুব্বি মানতাম। তাই তাঁকে ক্ষিপ্রহস্তে টেনে তুলে প্রতিদানে তার পা ছুঁয়ে বললাম, 'কী হয়েছে আদুভাই? অমন পাগলামি করলেন কেন?'
আদুভাই আমার মুখের দিকে তাকালেন। তাঁকে অমন বিচলিত জীবনে আর কখনো দেখিনি। তাঁর মুখের সর্বত্র অসহায়ের ভাব! তাঁর কাঁধে সজোরে ঝাঁকি দিয়ে বললাম, 'বলুন, কী হয়েছে?' আদুভাই কম্পিত কণ্ঠে বললেন : 'প্রমোশন।'
আমি বিস্মিত হলাম, বললাম, 'প্রমোশন? প্রমোশন কী? আপনি প্রমোশন পেয়েছেন?'
: না, আমি প্রমোশন পেতে চাই।
: ও, পেতে চান? সে তো সবাই চায়।

আদুভাই অপরাধীর ন্যায় উদ্‌বেগ-কম্পিত ও সংকোচ-জড়িত প্যাঁচ-মোচড় দিয়ে যা বললেন, তার মর্ম এই যে, প্রমোশনের জন্য এতদিন তিনি কারো কাছে কিছু বলেননি; কারণ, প্রমোশন জিনিসটাকে যথাসময়ের পূর্বে এগিয়ে আনাটা তিনি পছন্দ করেন না। কিন্তু একটা বিশেষ কারণে এবার তাঁকে প্রমোশন পেতেই হবে। সে নির্জনতায়ও তিনি আমার কানের কাছে মুখ এনে সেই কারণটি বললেন। তা এই যে, আদুভাইয়ের ছেলে সেবার ক্লাস সেভেনে প্রমোশন পেয়েছে। নিজের ছেলের প্রতি আদুভাইয়ের কোনো ঈর্ষা নেই। কাজেই ছেলের সঙ্গে এক শ্রেণিতে পড়ায় তাঁর আপত্তি ছিল না; কিন্তু আদুভাইয়ের স্ত্রীর তাতে ঘোরতর আপত্তি আছে। ফলে, হয় আদুভাইকে এবার প্রমোশন পেতে হবে, নয় তো পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হবে। পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে আদুভাই বাঁচবেন কী নিয়ে? আমি আদুভাইয়ের বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পারলাম। তাঁর অনুরোধে আমি শিক্ষকদের কাছে সুপারিশ করতে যেতে রাজি হলাম।

প্রথমে ফারসি শিক্ষকের কাছে যাওয়া স্থির করলাম। কারণ, তিনি একদা আমাকে মোট এক শত নম্বরের মধ্যে একশ পাঁচ নম্বর দিয়েছিলেন। বিস্মিত হেডমাস্টার তার কারণ জিজ্ঞেস করায় মৌলবি সাব বলেছিলেন, 'ছেলে সমস্ত প্রশ্নের শুদ্ধ উত্তর দেওয়ায় সে পূর্ণ নম্বর পেয়েছে। পূর্ণ নম্বর পাওয়ার পুরস্কারস্বরূপ আমি খুশি হয়ে তাকে পাঁচ নম্বর বখশিশ দিয়েছি।' অনেক তর্ক করেও হেডমাস্টার মৌলবি সাবকে এই কার্যের অসংগতি বুঝাতে পারেননি।

মৌলবি সাব আদুভাইয়ের নাম শুনে জ্বলে উঠলেন। অমন বেতমিজ ও খোদার না-ফরমান বান্দা তিনি কখনো দেখেননি, বলে আস্ফালন করলেন এবং অবশেষে টিনের বাক্স থেকে অনেক খুঁজে আদুভাইয়ের খাতা বের করে আমার সামনে ফেলে দিয়ে বললেন, 'দেখ।'

আমি দেখলাম, আদুভাই মোট তিন নম্বর পেয়েছেন। তবু হতাশ হলাম না। পাশের নম্বর দেওয়ার জন্য তাঁকে চেপে ধরলাম।

বড়ো দেরি হয়ে গিয়েছে, নম্বর সাবমিট করে ফেলেছেন, বিবেচনা স্তর পার হয়ে গিয়েছে ইত্যাদি সমস্ত যুক্তির আমি সন্তোষজনক জবাব দিলাম। তিনি বললেন, 'তুমি কার জন্য কী অন্যায় অনুরোধ করছ, খাতাটা খুলেই একবার দেখ না।'

আমি মৌলবি সাবকে খুশি করবার জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবং অনাবশ্যকবোধেও খাতাটা খুললাম। দেখলাম, ফারসি পরীক্ষা বটে, কিন্তু খাতার কোথাও একটি ফারসি হরফ নেই। তার বদলে ঠাস-বুনানো বাংলা হরফে অনেক কিছু লেখা আছে। পড়া শেষ করে মৌলবি সাবের মুখের দিকে চাইতেই বিজয়ের ভঙ্গিতে বললেন, 'দেখেছ বাবা, বেতমিজের কাজ? আমি নিতান্ত ভালো মানুষ বলেই তিনটে নম্বর দিয়েছি, অন্য কেউ হলে রাসটিকেটের সুপারিশ করত।'

যা হোক, শেষ পর্যন্ত মৌলবি সাব আমার অনুরোধ এড়াতে পারলেন না। খাতার ওপর ৩-এর পৃষ্ঠে ৩ বসিয়ে ৩৩ করে দিলেন।

আমি বিপুল আনন্দে অঙ্কের পরীক্ষকের বাড়ি ছুটলাম।

সেখানে দেখলাম, আদুভাইয়ের খাতার ওপর লাল পেনসি লের একটি প্রকাণ্ড ভূমণ্ডল আঁকা রয়েছে। ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝেও আমার উদ্দেশ্য বললাম। অঙ্কের মাস্টার তো হেসেই খুন। হাসতে হাসতে তিনি আদুভাইয়ের খাতা বের করে আমাকে অংশবিশেষ পড়ে শোনালেন। তাতে আদুভাই লিখেছেন যে, প্রশ্নকর্তা ভালো-ভালো অঙ্কের প্রশ্ন ফেলে কতগুলো বাজে ও অনাবশ্যক প্রশ্ন করেছেন। সেজন্য এবং প্রশ্নকর্তার ত্রুটি-সংশোধনের উদ্দেশ্যে আদুভাই নিজেই কতিপয় উৎকৃষ্ট প্রশ্ন লিখে তার বিশুদ্ধ উত্তর দিচ্ছে— এইরূপ ভূমিকা করে আদুভাই যে সমস্ত অঙ্কর করেছেন, শিক্ষক মহাশয় প্রশ্নপত্র ও খাতা মিলিয়ে আমাকে দেখালেন যে, প্রশ্নের সঙ্গে আদুভাইয়ের উত্তরের সত্যিই কোনো সংস্রব নেই।

প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মিল থাক আর না-ই থাক, খাতায় লেখা অংক শুদ্ধ হলেই নম্বর পাওয়া উচিত বলে আমি শিক্ষকের সঙ্গে অনেক ধস্তাধস্তি করলাম। শিক্ষক-মশায়, যাহোক, প্রমাণ করে দিলেন যে, তা-ও শুদ্ধ হয়নি। সুতরাং পাশের নম্বর দিতে তিনি রাজি হলেন না। তবে তিনি আমাকে এই আশ্বাস দিলেন যে, অন্যসব সাবজেক্টের শিক্ষকদের রাজি করাতে পারলে তিনি আদুভাইয়ের প্রমোশনে সুপারিশ করতে প্রস্তুত আছেন।
নিতান্ত বিষণ্ণমনে অন্যান্য পরীক্ষকের নিকটে গেলাম। সর্বত্র অবস্থা প্রায় একরূপ। ভূগোলের খাতায় তিনি লিখেছেন যে, পৃথিবী গোলাকার এবং সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, এমন গল্প তিনি বিশ্বাস করেন না। ইতিহাসের খাতায় তিনি লিখেছেন যে, কোন রাজা কোন সম্রাটের পুত্র এসব কথার কোনো প্রমাণ নেই। ইংরেজির খাতায় তিনি নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও লর্ড ক্লাইভের ছবি পাশাপাশি আঁকবার চেষ্টা করেছেন— অবশ্য কে যে সিরাজ, কে যে ক্লাইভ, নিচে লেখা না থাকলে তা বোঝা যেত না।

হতাশ হয়ে হোস্টেলে ফিরে এলাম। আদুভাই আগ্রহ-ব্যাকুল চোখে আমার পথপানে চেয়ে অপেক্ষা করছিলেন। আমি ফিরে এসে নিষ্ফলতার খবর দিতেই তাঁর মুখটি ফ্যাকাশে হয়ে গেল।
: তবে আমার কী হবে ভাই? — বলে তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।
কিছু একটা করবার জন্য আমার প্রাণও ব্যাকুল হয়ে উঠল। বললাম, 'তবে কি আদুভাই, আমি হেডমাস্টারের কাছে যাব?'
আদুভাই ক্ষণিক আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি আমার জন্য যা করেছ, সেজন্য ধন্যবাদ। হেডমাস্টারের কাছে তোমার গিয়ে কাজ নেই। সেখানে যেতে হয় আমিই যাব। হেডমাস্টারের কাছে জীবনে আমি কিছু চাইনি। এই প্রার্থনা তিনি আমার ফেলতে পারবেন না।'
বলেই তিনি হনহন করে বেরিয়ে গেলেন। আমি একদৃষ্টে দ্রুত গমনশীল আদুভাইয়ের দিকে চেয়ে রইলাম। তিনি দৃষ্টির আড়াল হলে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিজের কাজে মন দিলাম।

তিন.
সেদিন বড়োদিনের ছুটি আরম্ভ। শুধু হাজিরা লিখেই স্কুল ছুটি দেওয়া হলো।
আমি বাইরে এসে দেখলাম, স্কুলের গেটের সামনে একটি উঁচু টুল চেপে তার ওপর দাঁড়িয়ে আদুভাই হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা করছেন। ছাত্ররা ভিড় করে তাঁর বক্তৃতা শুনছে, মাঝে মাঝে করতালি দিচ্ছে।
আমি শ্রোতৃমণ্ডলীর ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

আদুভাই বলছিলেন, 'হ্যাঁ, প্রমোশন আমি মুখ ফুটে কখনো চাইনি। কিন্তু সেজন্যই কি আমাকে প্রমোশন না-দেওয়া এঁদের উচিত হয়েছে? মুখ ফুটে না-চেয়ে এতদিন আমি এঁদের আক্কেল পরীক্ষা করলাম। দেখলাম, বিবেচনা বলে কোনো জিনিস এঁদের মধ্যে নেই। এঁরা নির্মম, হৃদয়হীন। একটা মানুষ যে চোখ বুজে এঁদের বিবেচনার ওপর নিজের জীবন ছেড়ে দিয়ে আছে, এঁদের প্রাণ বলে কোনো জিনিস থাকলে সে কথা কি এঁরা এতদিন ভুলে থাকতে পারতেন?'

আদুভাইয়ের চোখ ছলছল করে উঠল। তিনি বাম হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছে আবার বলতে লাগলেন, 'আমি এঁদের কাছে কী আর বিশেষ চেয়েছিলাম? শুধু একটি প্রমোশন। তা দিলে এঁদের কী এমন লোকসান হতো? মনে করবেন না, প্রমোশন না দেওয়ায় আমি রেগে গেছি। রাগ আমি করিনি। আমি শুধু ভাবছি, যাঁদের বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর হাজার হাজার ছেলের বাপ-মা ছেলেদের জীবনের ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকেন, তাঁদের আক্কেল কত কম। তাঁদের প্রাণের পরিসর কত অল্প!'

একটু দম নিয়ে আদুভাই আরম্ভ করলেন, "আমি বহুকাল এই স্কুলে পড়ছি। একদিন এক পয়সা মাইনে কম দেইনি। বছর-বছর নতুন-নতুন পুস্তক ও খাতা কিনতে আপত্তি করিনি। ভাবুন, আমার কতগুলো টাকা গিয়েছে। আমি যদি প্রমোশনের এতই অযোগ্য ছিলাম, তবে এই দীর্ঘ দিনের মধ্যে একজন শিক্ষকও আমায় কেন বললেন না, 'আদুমিঞা তোমার প্রমোশনের কোনো চান্স নেই, তোমার মাইনেটা আমরা নেব না।' মাইনে দেওয়ার সময় কেউ বারণ করলেন না, পুস্তক কিনবার সময় কেউ নিষেধ করলেন না। শুধু প্রমোশনের বেলাতেই তাঁদের যত নিয়ম-কানুনে এসে বাঁধল? আমি ক্লাস সেভেন পাস করতে পারলাম না বলে ক্লাস এইটেও পাশ করতে পারতাম না, এ কথা এঁদের কে বলেছে? অনেকে ম্যাট্রিক-আইএ-তে কোনোমতে পাশ করে বিএ-এমএ-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত আমি অনেক দেখাতে পারি। কোনো কুগ্রহের ফেরেই আমি ক্লাস সেভেনে আটকে পড়েছি। একবার কোনোমতে এই ক্লাসটা ডিঙোতে পারলেই আমি ভালো করতে পারতাম, এটা বোঝা মাস্টারবাবুদের উচিত ছিল। আমাকে একবার ক্লাস এইটে প্রমোশন দিয়ে আমার লাইফের একটা চান্স এঁরা দিলেন না।"

আদুভাইর কণ্ঠরোধ হয়ে এল। তিনি খানিক থেমে ধুতির খুঁটে নাক-চোখ মুছে নিলেন। দেখলাম, শ্রোতৃগণের অনেকের গাল বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে।

গলা পরিষ্কার করে আদুভাই আবার শুরু করলেন, 'আমি কখনো এতসব কথা বলিনি, আজও বলতাম না। বললাম শুধু এই জন্য যে, আমার বড়ো ছেলে এবার ক্লাস সেভেনে প্রমোশন পেয়েছে। সে-ও এই স্কুলেই পড়ত। এই স্কুলের শিক্ষকদের বিবেচনায় আমার আস্থা নেই বলেই আমি গতবারই আমার ছেলেকে অন্য স্কুলে ট্রান্সফার করে দিয়েছিলাম। যথাসময়ে, এই সতর্কতা অবলম্বন না করলে, আজ আমাকে কী অপমানের মুখে পড়তে হতো, তা আপনারাই বিচার করুন।'

আদুভাইয়ের শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। তিনি গলায় দৃঢ়তা এনে আবার বলতে শুরু করলেন, 'কিন্তু আমি সত্যকে জয়যুক্ত করবই। আমি একদিন ক্লাস এইটে—'

এই সময় স্কুলের দারোয়ান এসে সভা ভেঙে দিল। আমি আদুভাইয়ের দৃষ্টি এড়িয়ে চুপে-চুপে সরে পড়লাম। তারপর যেমন হয়ে থাকে— সংসার-সাগরের প্রবল স্রোতে কে কোথায় ভেসে গেলাম, জানলাম না।

চার.

আমি সেবার বিএ পরীক্ষা দেব। খুব মন দিয়ে পড়ছিলাম। হঠাৎ লাল লেফাফার এক পত্র পেলাম। কারো বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র হবে মনে করে খুললাম। ঝরঝরে তকতকে সোনালি হরফে ছাপা পত্র। পত্রলেখক আদুভাই। তিনি লিখেছেন, তিনি সেবার ক্লাস সেভেন থেকে ক্লাস এইটে প্রমোশন পেয়েছেন বলে বন্ধু বান্ধবের জন্য কিছু ডাল-ভাতের ব্যবস্থা করেছেন।

দেখলাম, তারিখ অনেক আগেই চলে গিয়েছে। বাড়ি ঘুরে এসেছে বলে পত্র দেরিতে পেয়েছি। ছাপাচিঠির সঙ্গে হাতের লেখা একটি পত্র। আদুভাইয়ের পুত্র লিখেছে— বাবার অসুখ, আপনাকে দেখবেন তাঁর শেষ সাধ।

পড়াশোনা ফেলে ছুটে গেলাম আদুভাইকে দেখতে। এই চার বছর তাঁর কোনো খবর নিইনি বলে লজ্জা-অনুতাপে ছোটো হয়ে যাচ্ছিলাম।

ছেলে কেঁদে বলল, "বাবা মারা গিয়েছেন। প্রমোশনের জন্য তিনি এবার দিনভর এমন পড়াশোনা শুরু করেছিলেন যে শয্যা নিলেন, তবু পড়া ছাড়লেন না। আমরা সবাই তার জীবন সম্বন্ধে ভয় পেলাম। পাড়াসুদ্ধ লোক গিয়ে হেডমাস্টারকে ধরায় তিনি স্বয়ং এসে বাবাকে প্রমোশনের আশ্বাস দিলেন। বাবা অসুখ নিয়েই পাল্কি চড়ে স্কুলে গিয়ে শুয়ে-শুয়ে পরীক্ষা দিলেন। আগের কথামতো তাঁকে প্রমোশন দেওয়া হলো। তিনি তাঁর 'প্রমোশন-উৎসব' উদ্‌যাপন করবার জন্য আমাকে হুকুম দিলেন। কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করতে হবে, তার লিস্টও তিনি নিজহাতে করে দিলেন। কিন্তু সেই উৎসবে যাঁরা যোগ দিতে এলেন তাঁরা সবাই জানাজা পড়ে বাড়ি ফিরলেন।"

আমি চোখের পানি মুছে কবরের কাছে যেতে চাইলাম।

ছেলে আমাকে গোরস্তানে নিয়ে গেল। দেখলাম, আদুভাইয়ের কবরে খোদাই করা মার্বেল-পাথরের ট্যাবলেটে লেখা হয়েছে—

> Here sleeps Adu Mia who was promoted
> from Class VII to Class VIII.

ছেলে বলল, 'বাবার শেষ ইচ্ছামতোই ও-ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

লেখক-পরিচিতি

আবুল মনসুর আহমদের জন্ম ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালে। তিনি পেশায় ছিলেন সাংবাদিক। সাহিত্য-সাধনার মাধ্যমে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে সচেতন করে তোলাই ছিল তাঁর সারা জীবনের ব্রত। ব্যঙ্গধর্মী রচনার জন্য তিনি বিশেষ খ্যাতি পেয়েছেন। আবুল মনসুর আহমদের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে 'আয়না', 'আসমানী পর্দা', 'ফুড কনফারেন্স', 'গালিভারের সফরনামা' ইত্যাদি। সাহিত্যচর্চায় অবদান রাখার জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কার লাভ করেন। আবুল মনসুর আহমদ ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

আদু মিয়া ওরফে আদুভাই ক্লাস সেভেনে পড়তেন। স্কুলে তিনি ছিলেন নিয়মিত, চাল চলন ও আচার-আচরণে ছিলেন সবার প্রিয়। কিন্তু পরীক্ষায় পাশ করতে পারতেন না। তাঁর সহপাঠীদের অনেকে স্কুলের শিক্ষক পর্যন্ত হয়েছেন কিন্তু আদুভাই আর প্রমোশন পাননি। তাঁর ধারণা, ভালোভাবে পড়াশোনা করে তবেই না প্রমোশন। তাই তিনি পরীক্ষার উত্তরপত্রে নিজের মতো উত্তর করতেন, কখনো প্রশ্নও জুড়ে দিতেন। ফলে প্রমোশনও তাঁর মিলত না। কিন্তু আদুভাইয়ের ছেলে যখন অন্য একটা স্কুলে ক্লাস সেভেন পাশ করতে যাচ্ছে, তখন তিনি প্রমোশনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেন। এবার তিনি শুরু করলেন কঠোর পরিশ্রম। পরিশ্রমের ধকলে ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় আদুভাই পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ক্লাস সেভেন থেকে এইটে প্রমোশন পেলেন ঠিকই, তবে প্রমোশনের আনন্দ উদ্‌যাপনের দিনই তিনি মারা গেলেন।

গল্পটির ভেতর দিয়ে হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিতে লেখক দেখিয়েছেন, জ্ঞানার্জনের পথে বয়স কোনো বাধা নয়। আবার কোনো বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট স্তরে স্থির থাকাও যুক্তিযুক্ত নয়।

শব্দার্থ ও টীকা

সমপাঠী	— সহপাঠী।
অবিচ্ছেদ্য	— যা বিচ্ছেদ বা বিচ্ছিন্ন করা যায় না।
বিষণ্ন	— বিষাদযুক্ত, দুঃখপ্রাপ্ত।
সাবজেক্ট	— বিষয়। ইংরেজি Subject.
শর্ট	— কমতি, কম। ইংরেজি Short.
বরঞ্চ	— বরং।
প্রমোশন	— এক শ্রেণি থেকে অপর শ্রেণিতে উন্নীত। ইংরেজি Promotion.
সন্দেহবাদী	— কোনো বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেন যিনি।
তাচ্ছিল্য	— তুচ্ছ জ্ঞান, অবহেলা।
অনাদিকাল	— আদিকাল থেকে।
সচ্চরিত্র	— ভালো স্বভাব।
স্বরচিত	— নিজের লেখা।
নিরুৎসাহ	— উৎসাহ নেই এমন।
টেস্ট পরীক্ষা	— চূড়ান্ত পরীক্ষার আগে বাছাই পরীক্ষা।
টিউটোরিয়েল	— পর্যালোচনামূলক শ্রেণি-কার্যক্রম। ইংরেজি Tutorial.
ক্ষিপ্রহস্তে	— দ্রুত হাতে।
উদ্‌বেগ	— দুশ্চিন্তা।
অসংগতি	— সংগতির অভাব, যুক্তিহীনতা।
বেতমিজ	— শিষ্টাচার জ্ঞান নেই যার।
না-ফরমান বান্দা	— আদেশ অমান্যকারী ব্যক্তি।

আস্ফালন — ক্ষোভের সঙ্গে লাফালাফি।

গাঁজাখুরি — অবিশ্বাস্য।

নিষ্ফলতা — যে কাজের কোনো ফল নেই।

একদৃষ্টে — অপলক চোখে।

রাসটিকেট — একধরনের শাস্তি। স্কুল-কলেজে পড়া বাতিল করে দেওয়া। ইংরেজি Rusticate.

ভূমণ্ডল — পৃথিবী, ভূভাগ। এখানে পৃথিবীর মতো দেখতে গোলাকার 'শূন্য' বোঝানো হয়েছে।

পরীক্ষক — পরীক্ষা করেন এমন ব্যক্তি। পরীক্ষার উত্তরপত্র দেখেন এমন ব্যক্তি।

ফ্যাকাশে — বিবর্ণ, অনুজ্জ্বল।

সংস্রব — সংযোগ, সম্বন্ধ, মিল।

শ্রোতৃমণ্ডলী — শ্রোতাবৃন্দ।

প্রবল স্রোত — তীব্র স্রোত।

লেফাফা — খাম, মোড়ক।

পাড়াসুদ্ধ — পাড়ার সকলে।

ট্যাবলেট — কবরফলক, যাতে মৃতব্যক্তি বিষয়ে কিছু লেখা থাকে। ইংরেজি Tablet.
'Here sleeps Adu Mia who was promoted from Class VII to Class VIII'— 'এইখানে ঘুমিয়ে আছেন আদুমিয়া, যিনি সপ্তম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন।'

মারমা রূপকথা

হলুদ টিয়া সাদা টিয়া

বাংলা-রূপ : মাউচিং

অনেক দিন আগের কথা। এক গ্রামে এক জুমচাষি দম্পতি ছিল। তাদের একটি মেয়ে ছিল। খুবই সুখে দিন কাটছিল তাদের। প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে ওই দম্পতি রান্না বান্না সেরে, খেয়ে, জুমচাষের কাজে বেরিয়ে পড়ত। মেয়েটিকে ঘরে রেখে যেত। সে ঘর পাহারা দিত আর ঘরের খুঁটিনাটি কাজ করত। সন্ধ্যায়

মা-বাবা ফিরে আসত। আবার রাতের রান্না সেরে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। এভাবে তাদের দিন অতিবাহিত হতে লাগল। একদিন তারা মেয়েকে ধান শুকাতে বলে গেল। মা-বাবা বেরিয়ে যাবার পর তাদের নির্দেশমতো উঠানে ধান শুকাতে দিল। পাশে বসে সে পাহারা দিতে লাগল যাতে কোনো পশুপাখি খেতে না-পারে। ধান প্রায় শুকিয়ে এসেছে। তুলতে যাবে এমন সময় হঠাৎ কোথেকে এক ঝাঁক সাদা টিয়া আর হলুদ টিয়া এসে ধানের ওপর বসল। একটা-দুটো করে এক নিমেষে সব ধান খেয়ে শেষ করে ফেলল। মেয়েটি তাদেরকে অনেক নিষেধ করল। বলল, 'লক্ষ্মী টিয়ারা, তোমরা ধান খেয়ো না। বাবা-মা ফিরে এসে ধান না দেখলে আমাকে মেরে ফেলবে।' টিয়ারা বলল, 'আমরা একটু খাব, মা-বাবা বকলে, মারলে, আমাদের কাছে চলে এসো।' সন্ধ্যায় মা-বাবা ফিরে এসে ধান না দেখে মেয়েকে ভীষণ বকুনি দিল। তারা মনে করল, সে নিশ্চয় পাহারা দেয়নি।

পরদিন তারা আবার ধান শুকাতে দিয়ে গেল। সেদিনও একই ঘটনা ঘটল। সেদিন মা-বাবা মেয়েকে অলস ভেবে ভীষণ মারধর করল। মেয়েকে সাবধান করে বলল, 'আবার যদি টিয়াদের ধান খাওয়াস তাহলে তোকে মেরে তাড়িয়ে দেব।' তার পরদিনও ধান শুকাতে দিয়ে গেল। মেয়েটি শত চেষ্টা করেও টিয়াদের বারণ করে ধান রাখতে পারল না। সে বসে কাঁদতে লাগল। মা-বাবা ফিরে এসে বুঝতে পারল একই ঘটনা। এতে আর কোনো ভুল নেই। যেই কথা সেই কাজ। মেয়েকে তাড়িয়ে দিল। মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে টিয়াদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। অচেনা পথে যেতে যেতে যখন ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়ল, তখন একজন রাখালের দেখা পেল। মেয়েটি রাখালকে জিজ্ঞেস করল, 'রাখাল ভাই, তুমি কি সাদা টিয়া, হলুদ টিয়ার দেশের সন্ধান দিতে পারো?' রাখাল উত্তর দিল—

লক্ষ্মী মেয়ে বলছি তোমায় শোনো,
সাদা টিয়ে হলুদ টিয়ের সন্ধান তোমায় দেবো।
এক মুঠো ভাত, এক আঁজলা পানি খেয়ে একটু জিরিয়ে নাও
তারপরেতে সোজা ওই দক্ষিণ-পূর্ব দিকে যাও।

মেয়েটি তা-ই করল। একটু বিশ্রাম করে আবার পথ চলা শুরু করে দিল। যেতে যেতে এবার পৌঁছাল মেষপালকের কাছে। মেয়েটি মেষপালককে জিজ্ঞেস করল, 'মেষপালক ভাই, তুমি কি সাদা টিয়া হলুদ টিয়ার দেশ কোনদিকে বলতে পারো?' মেষপালক মেয়েটিকে আদর-যত্ন করে বসতে দিল। বলল—

লক্ষ্মী মেয়ে শোনো তোমায় বলি
এক মুঠো ভাত, এক আঁজলা পানি খাও, এই অনুরোধ করি।
সাদা টিয়ে হলুদ টিয়ের দেশে যেতে চাও
তো দক্ষিণপূর্ব দিকের পথটি ধরে যাও।

মেয়েটি মেষপালকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এগিয়ে চলল। সারাদিন যেতে যেতে সন্ধ্যায় পরিশ্রান্ত হয়ে এক অশ্বরক্ষকের কাছে পৌঁছাল। সে অশ্বরক্ষককে সাদা টিয়া, হলুদ টিয়ার দেশে যাওয়ার রাস্তা দেখিয়ে দিতে বলল। অশ্বরক্ষক বলল—

লক্ষ্মী মেয়ে, এক মুঠো ভাত, এক আঁজলা পানি খাও
শ্রান্ত তুমি, একটু জিরিয়ে নাও।
দক্ষিণপূর্ব দিকে তোমায় যেতে হবে
সাদা টিয়ে, হলুদ টিয়ের দেখা তবে পাবে।

এই বলে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর অশ্বরক্ষক মেয়েটিকে বিদায় দিল। মেয়েটি সারা দিন যেতে যেতে এবার সন্ধ্যায় হস্তীরক্ষকের কাছে গিয়ে পৌঁছাল। পথ যেন ফুরাতে চায় না। মেয়েটির মনে হলো সে, ক্লান্ত। তারপর হস্তীরক্ষকের কাছে জিজ্ঞাসা করল, 'সাদা টিয়া, হলুদ টিয়ার দেশে পৌঁছাতে আর কতদিন লাগবে?'
হস্তীরক্ষক তাকে সাহস দিয়ে বলল—

লক্ষ্মী মেয়ে এসেছ তুমি সঠিক পথটি ধরে
তবে এক মুঠো ভাত, এক আঁজলা পানি খেয়ে একটু জিরোতে হবে
আর মাত্র এক ক্রোশ পথ যেতে হবে
সাদা টিয়ে হলুদ টিয়ের তবেই দেখা পাবে।

হস্তীরক্ষকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার পথ চলতে লাগল মেয়েটি। সে বুঝতে পারল, সবাই তাকে সত্যি কথা বলছে, সঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েছে। সবাই তাকে ফেরার পথে তাদের আতিথ্য গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছে। এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করার পর মেয়েটি ক্লান্ত অবসন্ন দেহে অবশেষে টিয়াদের দেশে পৌঁছাল।
চারিদিকে তাকাতেই সামনে সে দেখতে পেল এক সুবর্ণ অট্টালিকা। একটু জিজ্ঞেস করতেই মেয়েটির পরিচয় ও উদ্দেশ্য জানতে পেরে সাদা টিয়া, হলুদ টিয়ারা তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাল। সোনার সিঁড়ি, রুপার সিঁড়ি কোনটা বেয়ে ঘরে ওঠার ইচ্ছা তারা জানতে চাইল। মেয়েটি বলল তারা, গরিব তাই কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে অভ্যস্ত। মেয়েটিকে তাই করতে দিল। বাড়িতে ঢুকে চারিদিকে ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি দেখে সে অবাক হয়ে গেল। পরিশ্রান্ত মেয়েটিকে স্নান করিয়ে সুন্দর সুন্দর পোশাক পরতে দিল।

তারপর সোনার থালায় রুপার থালায় করে রকমারি খাবার খেতে দিল। মেয়েটি ওইসব থালায় খেতে অভ্যস্ত নয় তাই সে সাধারণ থালায় খেল। জীবনে কোনোদিন খায়নি এমন খাবার! তাই সে খুব তৃপ্তি সহকারে খেল। শোবার ঘরে নিয়ে গেল রাতে। সেখানেও সোনার খাটে রুপার খাটে শুভ্র কোমল বিছানা করা হয়েছে দেখতে পেল। কোনোটাতে ঘুমাবে জানতে চাইলে মেয়েটি বলল, তারা গরিব। জীবনে কোনোদিন ওইসব খাটে শোয়নি। মেঝেতে শুতেই অভ্যস্ত। তারা তাকে মেঝেতেই শুতে দিল। পরদিন সে টিয়াদের তার দুঃখের কথা জানাল। মা-বাবা অলস, অকর্মণ্য ভেবে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। টিয়ারা তাকে সান্ত্বনা দিল। সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ, সাত কলস সোনা ও রুপার মোহর আর কয়েকজন রক্ষী দিয়ে মেয়েটিকে মা-বাবার কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিল। ফেরার পথে তার শুভাকাঙ্ক্ষী রাখাল, মেষপালক, অশ্বরক্ষক, হস্তীরক্ষক সবার সঙ্গে দেখা করে তাদের সহযোগিতার জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানাল। তারাও মেয়েটির ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে প্রাণভরে আশীর্বাদ করল।

অবশেষে মেয়েটি নিজের বাড়িতে এসে পৌঁছাল। মা-বাবা তাদের মেয়ে এবং সঙ্গে সোনা-রুপার মোহর পেয়ে তো মহাখুশি। পাড়াপ্রতিবেশীরাও মেয়েটির কাণ্ড দেখে তাজ্জব হয়ে গেল। সবাই কানাঘুষা করতে লাগল, এটা কীভাবে সম্ভব হলো। অনেকেই হিংসায় জ্বলে গেল। অনেকের লোভ সৃষ্টি হলো। এভাবে এক লোভী মা-বাবা তাদের মেয়েকে তাড়িয়ে দিল, সোনা-রুপার মোহর খোঁজ করে আনার জন্য। ওই মেয়েটি সবাইকে জিজ্ঞেস করে করে ঠিকই সাদা টিয়া হলুদ টিয়াদের দেশে পৌঁছাল।

লোভী বাপ-মায়ের সন্তানও লোভী ছিল। এই মেয়েটিকেও পূর্বের মেয়েটির অনুরূপ আদর-যত্ন করা হলো। লোভ সামলাতে না পেরে সে সোনার সিঁড়ি দিয়ে উঠল। সোনার থালায় খেল। সোনার খাটে ঘুমাল। পরদিন তার এখানে আগমনের কারণটা জানাল। টিয়ারা সব শুনে সাতটি কলস ভালো করে মুখ এঁটে মেয়েটিকে দিল। বলে দিল বাড়ি পৌঁছে চট করে যেন কলসের মুখ না খোলে। একটার ভিতর আরেকটা, এভাবে পরপর সাতটি তাঁবু খাটিয়ে সবচেয়ে ভিতরেরটাতে বংশের সব আত্মীয়স্বজনকে ডেকে জড়ো করে তারপর যেন কলসের মুখ খোলে। আত্মীয়স্বজন জড়ো হয়ে যখন কলসের মুখ খুলল তখন সাতটি কলস থেকে বিভিন্ন জাতের বিষধর সর্প বের হয়ে সবাইকে দংশন করে নির্বংশ করল।

লেখক-পরিচিতি

বাংলাদেশের মারমা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বহু পুরাতন ও মুখে মুখে প্রচলিত 'হলুদ টিয়া সাদা টিয়ার গল্প' বাংলায় ভাষারূপ দিয়েছেন মাউচিং। মাউচিং-এর জন্ম ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে রাঙামাটি জেলার চন্দ্রঘোনায়। পেশাজীবনে তিনি ছিলেন শিক্ষক।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

চাষি দম্পতির ছিল এক সহজ-সরল মেয়ে। মেয়েটির বাবা-মা জুমচাষের জন্য সেই ভোরে বেরিয়ে যেত আর কাজ শেষে ফিরত সন্ধ্যায়। তারা তাকে ঘর পাহারা দেওয়া ও অন্যান্য কাজের দায়িত্ব দিয়ে রেখে যেত। একবার ধান শুকাতে গিয়ে মেয়েটি দেখল, একদল হলুদ ও সাদা টিয়া পাখি সব ধান খেয়ে ফেলছে। অনেক অনুরোধ করেও সে তাদের থামাতে পারল না। পরপর কয়েক দিন একই ঘটনা ঘটায় বাবা-মা রেগে গিয়ে মেয়েটিকে তাড়িয়ে দিল। সে তখন খোঁজ খবর নিয়ে টিয়াদের রাজ্যে পৌঁছালে সম্পদশালী টিয়া পাখিরা তাকে অনেক আদর-যত্ন করল। কিন্তু মেয়েটি লোভ না করে সাদাসিধে জিনিস বেছে নিল। টিয়া পাখিরা খুশি হয়ে তাকে সাত কলস সোনার ও রুপার মোহর দিয়ে তার বাবা-মায়ের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করল। বাবা-মাও ভীষণ খুশি হলো। এই খবর গ্রামে ছড়িয়ে পড়ায় কেউ খুব অবাক হলো, কেউ-বা হিংসা করতে শুরু করল। কারো আবার ভীষণ লোভ হলো। এরকমই এক লোভী পরিবার তাদের মেয়েকে তাড়িয়ে দিল সোনা-রুপা পাওয়ার লোভে। সে টিয়া পাখিদের রাজ্যে পৌঁছে লোভ সামলাতে পারল না। তার আচরণ দেখে টিয়া পাখিরা সব বুঝতে পারল। তখন সাতটি কলসের মুখ বেঁধে তারা মেয়েটিকে বলল, বংশের সব আত্মীয় স্বজনকে নিয়ে যেন কলসের মুখ খোলা হয়। বাড়ি ফিরে সবাইকে জড়ো করে মেয়েটি যখন কলসের মুখ খুলল, তখন কলস থেকে বিভিন্ন জাতের সাপ বের হয়ে সবাইকে কামড়ে মেরে ফেলল। এভাবে মেয়েটির পুরো পরিবার নির্বংশ হয়ে লোভের শাস্তি ভোগ করল।

গল্পটিতে সৎ ও নির্লোভ মানুষের জীবনে শেষপর্যন্ত শান্তি-স্বস্তি ফিরে পাওয়া এবং লোভী মানুষের নির্মম পরিণতি দেখানো হয়েছে।

শব্দার্থ ও টীকা

জুমচাষ — পাহাড়ি অঞ্চলে একধরনের চাষাবাদ।
প্রত্যুষে — ভোরে। খুব সকালে।
অতিবাহিত — পার হওয়া।
কোত্থেকে — কোথা থেকে।
বকুনি — ধমক। তিরস্কার।
বারণ — নিষেধ।
আঁজলা — করপুট।
অশ্বরক্ষক — ঘোড়া লালন-পালন করে যে।
জিরিয়ে — বিশ্রাম নিয়ে।
হস্তীরক্ষক — হাতি দেখাশোনা করে যে।
ক্রোশ — দূরত্বের পরিমাণবাচক শব্দ। দুই মাইলের কিছু বেশি।
আতিথ্য — অতিথিসেবা।
অবসন্ন — ক্লান্ত, শ্রান্ত।
অকর্মণ্য — কর্মক্ষম নয় এমন। অপটু।
অতিক্রম — পার হওয়া।
সুবর্ণ — সোনার মতো রঙ।
অভ্যর্থনা — সাদরে গ্রহণ।
অভ্যস্ত — অভ্যাসের অধীন।
শুভাকাঙ্ক্ষী — কল্যাণকামী।
কানাঘুষা — গোপনে কথা বলা।
দংশন — দাঁত-বসানো, কামড়।
অনুরূপ — সমান।
বংশ — কুল, গোষ্ঠী।
নির্বংশ — বংশধর নেই এমন। কুলহীন।

একটি সুখী গাছের গল্প

শেল সিলভারস্টাইন

অনুবাদ : জি এইচ হাবীব

এক যে ছিল আমগাছ। খুব ভালোবাসত সে একটি ছোট্ট ছেলেকে। হররোজ সেই ছেলেটি এসে গাছটার সব ঝরাপাতা কুড়িয়ে তাই দিয়ে মুকুট বানিয়ে বনের রাজা সাজত। কখনো-বা গাছটার কাণ্ড বেয়ে তরতর করে ওপরে উঠে ডাল ধরে দোল খেতো, আর আম খেতো। মাঝে মাঝে তারা লুকোচুরি খেলত। তারপর, এইসব করে ক্লান্ত হয়ে গেলে ছেলেটা পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ত গাছটার ছায়ায়। ছেলেটাও গাছটাকে ভালোবাসত খু-উ-ব। এবং গাছটা এতে সুখী ছিল।

কিন্তু সময় গড়িয়ে যেতে থাকে। ছেলেটাও বড়ো হয়ে উঠতে থাকে।

প্রায়ই দেখা যেত গাছটা দাঁড়িয়ে আছে একলা।

তো একদিন ছেলেটা গাছটার কাছে আসে, আর তখন গাছটা বলে, 'আয়, আয়, আমার গা বেয়ে উঠে ডাল ধরে দোল খা, আম খা, খেল আমার ছায়ায় বসে। আরাম কর। তোর সুখ দেখে আমি সুখ পাই।' কিন্তু ছেলেটা বলে, 'এখন কি আর আমার গাছে উঠে খেলার বয়স আছে নাকি? আমি এখন নানান সব জিনিস কিনতে চাই, মজা করতে চাই। আমার চাই কিছু টাকা। তুমি কিছু টাকা দিতে পারো আমায়?' গাছটা বলে, 'এই তো মুশকিলে

ফেললি। আমার কাছে তো টাকা নেই। আমার আছে কেবল পাতা আর আম। তা, এক কাজ করিস না কেন; আমার আমগুলো পেড়ে নে; ওগুলো বিক্রি করলে অনেক টাকা পাবি। তখন মনের সাধ মিটিয়ে কেনাকাটা করতে পারবি।'

কাজেই, ছেলেটা তখন গাছে উঠে আমগুলো পেড়ে সেগুলো নিয়ে চলে যায়। খুব খুশি হয় গাছটা।

কিন্তু এরপর আবার বেশ কিছুদিন কোনো দেখা মেলে না ছেলেটার ...। মন খারাপ করে থাকে গাছটা।

তারপর একদিন আবার আসে ছেলেটা। খুশিতে সারা শরীর নেচে ওঠে গাছটার। বলে, 'আয় আয়, আমার গা বেয়ে উঠে আয় ওপরে, দোল খা ডাল ধরে, ফুর্তি কর।'

কিন্তু ছেলেটা বলে, 'গাছে ওঠার চেয়ে ঢের জরুরি কাজ আছে আমার। মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই, একটা বাড়ি চাই আমার; রোদ-বৃষ্টিতে, গ্রীষ্মে-শীতে যাতে কষ্ট না হয়। আমার চাই একটা বউ, ছেলেমেয়ে। ওদেরকে রাখার জন্যে একটা বাড়ি আমার খুব দরকার। তুমি একটা বাড়ি দিতে পারো আমায়?'

গাছ বলে, 'আমার তো কোনো বাড়ি নেই, তবে হ্যাঁ, আমার ডালপালাগুলো কেটে নিতে পারিস। তাহলে খুব সহজেই ওগুলো দিয়ে একটি বাড়ি বানিয়ে নিতে পারবি তুই। তখন তোর আর সুখের সীমা থাকবে না।'

কাজেই ছেলেটা তখন গাছটার ডালপালা সব কেটে ফেলে, তারপর সেগুলো নিয়ে চলে যায় বাড়ি বানাবার জন্য। খুশি হয় গাছটা।

তারপর বেশ কিছু দিন আর কোনো খোঁজ-খবরই থাকে না ছেলেটার। তবে একদিন যখন আবার আসে সে, ভীষণ খুশি হয় গাছটা। এত্ত খুশি যে কথাই বলতে পারে না সে কিছুক্ষণ। তারপর ফিসফিসিয়ে বলে, 'আয় আয়, খেলবি আয়।'

ছেলেটা বলে, 'খেলার বয়স আর মোটেই নেই আমার। বুড়ো হয়ে গেছি। তাছাড়া মনটাও খুব খারাপ। একটা যদি নৌকা পেতাম তাহলে খুব ভালো হতো। ওটাতে চেপে বহু দূরে চলে যেতে পারতাম এখান থেকে। একটা নৌকা দিতে পারো তুমি আমায়?'

'আমার কাণ্ডটা কেটে ফেল, তারপর একটা নৌকা বানিয়ে নে ওটা দিয়ে,' গাছটা পরামর্শ দেয়। 'তখন ওটাতে করে তুই ভেসে বেড়াতে পারবি, খুশি হবি।'

কাজেই ছেলেটা তখন গাছটার কাণ্ডটা কেটে ফেলে, তারপর ওটা দিয়ে নৌকা বানিয়ে ভেসে পড়ে দূরদেশের উদ্দেশে। খুশি হয় গাছটা। কিন্তু তার বুকের ভেতর কোথায় যেন খচখচ করতে থাকে।

বহুদিন পর আবার ফিরে আসে ছেলেটা। গাছটা তখন বলে, 'আয়, কিন্তু এবার যে তোকে দেওয়ার মতো আর কিছুই নেই আমার রে— আমার আমগুলো আর নেই।'

কিন্তু ছেলেটা বলে, 'আম যে খাব এমন শক্তি কি আর আছে আমার দাঁতে?'

গাছটা বলে, 'আমার ডালপালাগুলোও যে আর নেই রে। ওগুলো ধরে তুই আর ঝুলতে পারবি না।'

ছেলেটা বলে, 'আমি এখন এতই বুড়ো হয়ে গেছি যে গাছের ডাল ধরে ঝুলোঝুলি করার আর শক্তি নেই আমার।'

গাছ বলে, 'কাণ্ডটাও তো নেই, তুই তো ওটা বেয়ে ওপরে উঠতে পারবি না।'

ছেলেটা সে কথা শুনে বলে, 'আমি আসলে এত ক্লান্ত যে গাছ বেয়ে ওঠার জোর নেই আমার গায়ে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গাছটা বলে, 'আমার খুব খারাপ লাগছে রে। তোকে যদি একটা কিছু অন্তত দিতে পারতাম... কিন্তু কিছুই যে নেই আমার। আমি স্রেফ বুড়ি গুঁড়ি একটা। আমায় ক্ষমা করে দে তুই।'

ছেলেটা বলে, 'এখন আমার আর খুব বেশি কিছু নেই চাইবার। বসে জিরোবার মতো স্রেফ একটা নিরিবিলি জায়গা হলেই যথেষ্ট। ভীষণ ক্লান্ত আমি।' যদ্দুর পারা যায় নিজেকে সোজা করে গাছটা বলে, 'তা, বেশ তো, বুড়ি

গুঁড়ি আর কিছু না হোক, বসে জিরোবার মতো একটা ভালো জায়গা তো বটেই। আয়, আয়, বোস, জিরিয়ে নে তোর যত খুশি।'
ছেলেটা তা-ই করে।
এইবার সত্যি সত্যি-ই খুশি হয় গাছটা।

লেখক-পরিচিতি

শেল সিলভারস্টাইনের পুরো নাম শেলডন অ্যালান সিলভারস্টাইন। তিনি আমেরিকার শিকাগোতে ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, শিশুসাহিত্যিক, গীতিকার, নাট্যকার ও কার্টুনিস্ট। তাঁর রচিত গান বব ডিলানসহ বিশ্বের বিখ্যাত শিল্পীরা পরিবেশন করেছেন। সিলভারস্টাইনের জনপ্রিয় গ্রন্থগুলো হলো– 'দ্য গিভিং ট্রি', 'দ্য মিসিং পিস', 'হোয়্যার দ্য সাইডওয়াক এন্ডস', 'এ জিরাফ অ্যান্ড এ হাফ' প্রভৃতি। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ বিশ্বের প্রায় ৩০টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সিলভারস্টাইন ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

অনুবাদক-পরিচিতি

জি এইচ হাবীব (গোলাম হোসেন হাবীব) জন্মগ্রহণ করেছেন ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায়। অধ্যাপনা করছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর অনূদিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের 'নিঃসঙ্গতার একশ বছর', ইয়াস্তেন গার্ডারের 'সোফির জগৎ', আমোস টুটুওলার 'তাড়িখোর' উল্লেখযোগ্য।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

শেল সিলভারস্টাইনের বিখ্যাত রচনা 'দ্য গিভিং ট্রি' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ 'একটি সুখী গাছের গল্প'। ছোটো একটি ছেলের বেড়ে ওঠা থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে একটি আমগাছের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে রচিত এই গল্প। বলা যায়, বিভিন্ন প্রয়োজনে ধাপে ধাপে গাছটির কাছ থেকে মানুষের একতরফা সুবিধা নেওয়ারই গল্প এটি। গাছটির সব কিছু নিয়েও মানুষটি সুখী হতে পারল না। শেষপর্যন্ত ফিরে এল কাণ্ড কেটে নেওয়া আমগাছের সেই গুঁড়ির কাছেই। সেখানেই সে খুঁজে পেল প্রশান্তি। প্রকৃতি ধ্বংস করে আধুনিক সভ্যতা গড়ে তুলতে গিয়ে মানুষ যে নিজেকে নিঃস্ব ও অসহায় করে ফেলছে তারই প্রতীক গল্পের মানুষটি।
সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে আমগাছটির যে সুখের অনুভব– মানুষ হিসেবে অপরের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার এই মহত্তম শিক্ষাও এ গল্পের বিশেষ দিক।

শব্দার্থ ও টীকা

হররোজ — প্রতিদিন।
কাণ্ড — গাছের গুঁড়ি।
তরতর — দ্রুত, তাড়াতাড়ি।
নিশ্চিন্ত — ভাবনাহীন।
লুকোচুরি — শিশুদের এক ধরনের খেলা।
মুশকিল — বিপদ। সংকট। আরবি শব্দ।
ঠাঁই — স্থান। আশ্রয়।
জিরোবার — বিশ্রাম নেবার।
যদ্দুর — যত দূর।

অতিথি

হোমার

রূপান্তর : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

অডিসিয়ুস নগরে ঢুকেছেন। তখন রাত নেমেছে এই অজানা নগরে। পদে পদে তাঁর দুশ্চিন্তা। পথে একটি মেয়েকে দেখতে পেয়ে বললেন, 'এই যে মেয়ে, শোনো, আমি এদেশের লোক নই। বাইরে থেকে এসেছি। কাউকে চিনি না এখানকার। আমি রাজবাড়ি যাব। বলে দেবে কি তার পথটা কোনদিকে?'

মেয়েটির বাড়ি রাজবাড়ির কাছেই। তার স্বভাবটি ভারি মিষ্টি। সে বলল, 'আমার সঙ্গে আসুন। দেখিয়ে দেবো। কিন্তু আপনি যে বিদেশি তা কাউকে আর বুঝতে দেবেন না। কারো সঙ্গে কথা বলবেন না। বিদেশিদের আমরা বড়ো একটা পছন্দ করি না।' অডিসিয়ুস বুঝলেন এ মেয়ে খুব বুদ্ধিমতী। কোনো কথা না বলে তিনি চললেন ওর পিছু পিছু।
অডিসিয়ুস দেখলেন, নগরটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরের ওপরে জাহাজের মাস্তুল সব দাঁড়িয়ে আছে আকাশের দিকে তাকিয়ে।

কিছুদূর গিয়েই দেখেন, চোখের সামনে জেগে উঠেছে রাজবাড়ি। দেখলেন, চমৎকার এক দৃশ্য। দূর থেকেই চোখে পড়ল রাজবাড়ির সামনের সারি সারি ফলের গাছ। ডালিমের, আপেলের, নাশপাতির, ডুমুরের, জলপাইয়ের। এখানে ফল মনে হয়, কখনো শেষ হবে না। আসলে তাই। সেসব গাছের এক দল ফল দেয় গ্রীষ্মকালে, আরেক দল শীতে। সারা বছর ধরেই ফুল ফুটছে, ফল পাকছে। লতিয়ে উঠেছে আঙুরলতা। থোকা থোকা ঝুলছে আঙুর। এক দিক দিয়ে পাকে আরেক দিক দিয়ে ফলে। তরকারিরও চাষ আছে দেখলেন অডিসিয়ুস। সবুজেরা যেন আপন মনে খেলছে। মাঠের দুপাশে দুটো ঝরনা। একটি এঁকেবেঁকে চলে গেছে মাঠের মধ্য দিয়ে। অন্যটি সারা শহরের লোকদের পানির জোগান দেওয়া শেষ করে এখন এসে যেন বিশ্রাম নিচ্ছে রাজবাড়ির কাছে। নিজে না দেখলে সেই দৃশ্যের বর্ণনা দেয়াও কঠিন।

অডিসিয়ুস দেখলেন যে রাজপ্রাসাদের দরজাগুলো সোনা দিয়ে তৈরি। দরজার কাঠামো কাঠের নয়, রুপার। হাতলগুলো সোনার। এগিয়ে দেখেন ভেতরে অনেকগুলো কুকুর, কোনোটি সোনার, কোনোটি রুপার, যেন পাহারা দিচ্ছে সবাই মিলে। ভেতরে ঢুকতেই চোখ পড়ল দেয়ালের পাশে উঁচু উঁচু সব আসন বসানো। প্রতিটি ঢাকা অতি সুন্দর কাপড়ে। রাজবাড়ির মেয়েরা সবাই কাজ করে। কেউ শস্য ভাঙে খুব মিহি করে। কেউ-বা তাঁত বোনে, কেউ কাটে সুতা। এই দেশে ছেলেদের দক্ষতা যেমন জাহাজ চালানোতে, মেয়েদের দক্ষতা তেমনি গৃহকাজে। এর মধ্য দিয়ে অডিসিয়ুস টিপটিপ করা বুকে এগিয়ে এলেন সামনে। দেখেন, সোনার তৈরি যুবকেরা সব মশাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আর গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সব খেতে বসেছেন একসঙ্গে। সিংহাসন দেখে অডিসিয়ুস রাজাকে চিনলেন, চেহারা দেখে রানিকে। সোজা চলে গেলেন সেদিকেই। রাজাকে পার হয়ে রানির সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসে হাত ধরলেন রানির।

হঠাৎ এমন একটা ঘটনা দেখে থ-মেরে গেছে সবাই। কারো মুখে রা নেই। কাউকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে অডিসিয়ুসই শুরু করে দিলেন তাঁর নিজের কথা। বললেন, 'মহারানি, দয়া করে আমার কথাটি শুনুন। আমি এসেছি আপনাদের কাছে সাহায্য চাইতে। আপনার অতিথিদের কাছেও আমার একই আবেদন। আমি দেশছাড়া পথহারা এক পথিক। আমার প্রার্থনা, আপনারা আমাকে আমার দেশে পাঠিয়ে দেবার একটা ব্যবস্থা করুন।'
আবেদন শেষে রাজা-রানির সামনে ওই মেঝের ওপরেই বসে পড়লেন অডিসিয়ুস। দেখা গেল, কেউই কোনো কথা বলছেন না। বোধ করি বিস্ময় কাটছে না তাঁদের। শেষে একজন কথা বললেন। বয়সে বৃদ্ধ তিনি, ধনী

জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায়। কথা বলেন চমৎকার। তিনি বললেন, 'রাজা আলসিনৌস, এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। ইনি আগন্তুক, ধুলোতে বসে আছেন। আপনার উচিত একে উঠে বসতে বলা। এঁর জন্য খাবার আনতে হুকুম করা। আমরা সবাই তো অপেক্ষা করে আছি আপনি কী বলেন সেটা শোনার জন্য।'

আলসিনৌসের তখন খেয়াল হলো। অডিসিয়ুসকে হাত ধরে তুললেন তিনি। রুপার তৈরি আসনে বসতে দিলেন তাঁকে। রাজপুত্রদের একজন উঠে গেল রাজার ইশারায়, সেই আসনেই বসলেন অডিসিয়ুস। হাত ধোয়ার পাত্র এল। টেবিল এল সামনে। তারপর এল অত্যন্ত সুস্বাদু সব খাবার। রাজা বললেন, 'আপনারা সবাই ফিসিয়ানদের চালক ও পরামর্শদাতা। রাত তো এখন অনেক হয়েছে। খাওয়া দাওয়াও শেষ হয়েছে আমাদের। আজ এ-পর্যন্তই থাক। কাল সকালে বরং আমরা আবার মিলিত হব। তখন ঠিক করা যাবে এই অতিথির জন্য আমরা কী করতে পারি। জানি না, এঁর দেশ কোথায়, কত দূরে। যেখানেই হোক, যত দূরেই হোক, যাতে তিনি সহজে, নিরাপদে দেশে পৌঁছতে পারেন তার ব্যবস্থা অবশ্যই করা যাবে। আমরা ব্যবস্থা করব, সঙ্গে লোকও দেবো। এঁকে নিজের দেশে পৌঁছে দেবো। তবে আর একটা কথা। এমনও তো হতে পারে যে, ইনি আদপে মানুষই নন। মানুষের ছদ্মবেশ ধরে এসেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন অডিসিয়ুস, 'ধন্যবাদ মহারাজ, ওই একটা বিষয়ে আপনাকে নিশ্চিত করতে পারি। আমি মানুষই। ছদ্মবেশী দেবতা নই। আমার দুঃখের লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে আমি আপনাদের বিরক্ত করতে চাই না। কষ্টে কষ্টে আমার হৃদয় শক্ত পাথর হয়ে যাওয়ার কথা। তবু ওই যে আপনাদের সামনে খাবার খেলাম অমন গপগপ করে, সে শুধু এই জন্যই যে আমি মানুষ, আর মানুষের পক্ষে ক্ষুধার চেয়ে বড়ো কোনো মুনিব নেই। প্রার্থনা এখন আমার কেবল একটাই, কাল সকালেই আপনাদের এই ভাগ্যাহত অতিথির যাত্রার ব্যবস্থাটা করুন। এখন একটি মাত্র ইচ্ছাই শুধু বেঁচে আছে; দেশের মাটিতে, আপনজনের মাঝখানে যেন আমি মরতে পারি। ব্যস আর কিছু নয়।'

অডিসিয়ুসের কথা বিফলে গেল না। মনে হলো খুশি হয়েছেন সবাই। একবাক্যে সবাই মিলে রায় দিলেন যে এঁকে স্বদেশে পাঠানোই ঠিক। তারপর তাঁরা বিদায় নিলেন পরস্পরের কাছ থেকে। চলে গেলেন যে যাঁর বাড়ি। রইলেন শুধু রাজা আলসিনৌস আর রানি এরিতি এবং তাঁদের সঙ্গে বসে সাহায্যপ্রার্থী অডিসিয়ুস। নারী গৃহকর্মীরা খাবারের পাত্রগুলো সরিয়ে নিচ্ছিল। এঁরা তিনজন কথা বলছিলেন।

রানিই প্রথমে বললেন কথা। অডিসিয়ুসের গায়ে তিনি তাঁর পরিচিত জামা কাপড় দেখে ভারি অবাক হয়েছেন। সেজন্য সরাসরিই প্রশ্ন করলেন তিনি। বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, আমি সরাসরিই জিজ্ঞেস করছি আপনাকে। আপনি কে? কোথা থেকে এসেছেন? গায়ের জামা কাপড়গুলোই-বা পেলেন কোথায়? আপনি না বললেন যে আপনি এখানে এসেছেন ঘটনাচক্রে?'

সতর্কভাবে তখন জবাব দিলেন অডিসিয়ুস। বললেন আপন কাহিনি। 'মহারানি, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার কাহিনি একটানা দুর্ভোগেরই কাহিনি। সেটা শুনতে গেলে আপনি বিরক্ত হবেন। সংক্ষেপে আমি আপনার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। ওই যে সমুদ্র আপনাদের দেশকে ঘিরে রেখেছে, ওই সমুদ্রেরই এক অজানা কোণে দ্বীপ আছে একটি। সেখানে জনপ্রাণী নেই, আছেন কেবল কেলিপসো। দেবী তিনি, সৌন্দর্যে তুলনাবিহীন। কিন্তু অন্যদিকে আবার ভীষণ ভয়ংকর। তাঁর ভয়ে সে দ্বীপে মানুষ তো ঘেঁষেই না, দেবতারাও পা দেন না। অথচ এমনি কপাল আমার যে সেই দ্বীপে গিয়েই আছড়ে পড়েছিলাম আমি। না, কোনো সঙ্গী ছিল না আমার। সঙ্গী যাঁরা ছিলেন, একসঙ্গে জাহাজে ছিলাম যাঁদের সঙ্গে, তাঁরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন। মাঝ সমুদ্রে বজ্রের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল জাহাজ। কেবল আমিই বাঁচলাম, কোনোমতে। তক্তা ধরে ভাসতে ভাসতে নয় দিন পর দশ দিনের দিন রাতের বেলা অন্ধকারে আছড়ে গিয়ে পড়েছিলাম ওই দ্বীপে। সেই অনিন্দ্যসুন্দর দেবী আমাকে তুলে নিলেন। যত্ন করলেন। এ-ও বললেন যে, অমরতা দেবেন আমাকে, আমার আর বয়স বাড়বে না কোনোদিনই। কিন্তু একদিনের জন্য কেন, এক মুহূর্তের জন্যও আমার মনে কোনো শান্তি ছিল না। আমি আমার দেশকে ভুলতে পারিনি। সাত বছর ছিলাম সেই দ্বীপে। আমার চোখের পানি আকাশ দেখত, বাতাস দেখত। আর সেই পানিতে কাপড় ভিজত।

'অষ্টম বছরে কেন জানি না দেবীর হঠাৎ দয়া হলো। তিনি বললেন, যেতে দেবেন। নিজের হাতে নৌকা তৈরি করলাম আমি। তিনি সঙ্গে দিলেন প্রচুর পরিমাণে খাবার, আর কোনোকালেই ধ্বংস হবে না এমন জামাকাপড়। বাতাস দিলেন অনুকূল। রওনা তো হলাম। সতেরো দিন সমানে চলল নৌকা। আঠারো দিনের দিন দূরে দেখলাম, ছায়ার মতো ভেসে উঠেছে আপনাদের পাহাড়-পর্বতগুলো। আমার খুশি তখন দেখে কে। কিন্তু হায়, সেই হাসিখুশি বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। হঠাৎ দেখি ঝড় উঠেছে, আর সেই সঙ্গে উতলা হয়ে উঠেছে সমুদ্র। কী করব ঠিক করতে পারছি না। এমন কী ঘটেছে সেটা বুঝে ওঠার আগেই চোখের সামনে দেখলাম, নৌকাটা ভেঙে একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তবু পানিতে মাছের মতো সাঁতরে কোনোমতে বেঁচে রইলাম। তারপর বাতাস ও স্রোতের মুখে চলে এসেছি আপনাদের তটভূমিতে। কিন্তু পাড়ে উঠবার চেষ্টা করে দেখি-না, সে উপায় নেই। তাই আবারও সাঁতরাতে থাকলাম। শেষে একটা নদীর মুখ পেয়ে সেখানে ঢুকে ওঠার মতো জায়গা পেলাম একটু। জায়গাটা পাহাড়ি নয়, বাতাস যে আক্রমণ করবে তেমনও নয়।

'কোনোমতে পাড়ে উঠে আশ্রয় খুঁজলাম। এরই মধ্যে রাত এল নেমে। একটা ঝোপের ভেতর ঢুকে এলিয়ে দিলাম শরীর। সারা রাত অজ্ঞানের মতো ঘুমিয়ে, অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠেছি। সত্যি কথা বলতে কি, সূর্য তখন ওঠার দিকে নয় ডোবার দিকেই বরং। ঘুম ভাঙলে দেখি রাজ,কন্যার সঙ্গিনীরা বল নিয়ে ছোটাছুটি করে খেলছেন। স্বয়ং রাজকন্যাও আছেন তাদের সঙ্গে। রাজকন্যাকে দেখে তো প্রথমে মনে হয়েছিল কোনো দেবীকে দেখছি বুঝি। তাঁর কাছেই আবেদন করেছিলাম সাহায্যের জন্য। চমৎকার বিচক্ষণতা তাঁর। তিনি খাবার দিয়েছেন, জামা কাপড় দিয়েছেন। এই হলো বৃত্তান্ত আমার।'

রাজা আলসিনৌস বললেন, 'রাজকন্যা যা করেছে ঠিকই করেছে, তবে অপরাধ করেছে একটা। তার উচিত ছিল আপনাকে সরাসরি রাজবাড়িতেই নিয়ে আসা। সর্বপ্রথম তার কাছেই তো আপনি সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন।'

অডিসিয়ুস বললেন, 'মহারাজ, সেটা আপনার মেয়ের দোষ নয়। আমি নিজেও রাজি হতাম না সরাসরি আপনার কাছে আসতে। আমার ভয়, ছিল আপনি হয়তো খুশি হবেন না আমাকে দেখে।' রাজা শুনে হাসলেন। বললেন, 'এসব সামান্য ব্যাপারে আমরা রাগ করি না। আমি দেখছি স্বভাবের দিক থেকে আপনার সঙ্গে আমাদের গরমিল নেই। আপনি ইচ্ছে করলে স্বাচ্ছন্দ্যে আমাদের এখানে থাকতে পারেন। আতিথেয়তার কোনো ত্রুটি হবে না। আর যদি মনে করেন চলে যাবেন তাতেও আমরা কেউ বাধা দেবো না। আপনার দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য আমি কী বলি শুনুন। আমি বলি, আপনি যদি চান কাল সকালেই রওনা হতে পারেন। আপনি জাহাজে যাবেন। আমাদের সুদক্ষ নাবিকেরা টানবে তার দাঁড়। ঘুমাতে ঘুমাতে চলে যাবেন। দূরত্বের প্রশ্ন নেই। সমুদ্রের শেষ প্রান্তেও যদি হয় আপনার দেশ, তবু আপত্তি নেই আমাদের। আমরা পৌঁছে দেবো আপনাকে। আপনি দেখবেন আমাদের নাবিকদের দক্ষতা।'

ধৈর্য ধরে শোনেন অডিসিয়ুস। তাঁর বুক ভরে ওঠে আশায়। কথাবার্তা যখন চলছিল তারই ফাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন রানি এরিতি। গৃহকর্মীরা লেগে গিয়েছিল কাজে। মশাল হাতে নিঃশব্দ তৎপরতা তাদের। সুন্দর খাট এনে বিছিয়ে দিল একটা। ভারী বিছানা দিল পেতে। ওপরে পাড়ল চাদর। এনে রাখল গরম কম্বল। সব কাজ শেষ হলে অডিসিয়ুসের কাছে এসে বলল তারা, 'আপনার বিছানা তৈরি। ইচ্ছা করলে ঘুমুতে পারেন।' আর তখুনি বুঝলেন অডিসিয়ুস, ঘুমানো তাঁর জন্য কী ভীষণ প্রয়োজন।
এতসব বিপদ ও উদ্‌বেগের শেষে রাতের বেলা নিশ্চিন্তে, আরামে ঘুমালেন তিনি।

লেখক-পরিচিতি

গ্রিস দেশের আদি কবি হোমার। পৃথিবীর বিখ্যাত দুটি মহাকাব্য 'ইলিয়াড' ও 'অডিসি' তাঁর রচনা। হোমারের জীবনকাল নিয়ে মতভেদ আছে। তবে অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে তিনি ৮৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ জীবিত ছিলেন। হোমার অন্ধ ছিলেন এমন একটি কথাও প্রচলিত আছে; কিন্তু তার কোনো তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়নি। হোমারের কাব্যের বিষয় ছিল গ্রিক জাতির বীরত্ব ও ঐতিহাসিক ট্রয় নগরীর পতন। অসংখ্য দেবদেবী আর মানুষের সমাবেশ আছে তাঁর কাব্যে। মানুষ, মানবতা আর দেশপ্রেম হোমারের কাব্যে সবচেয়ে বেশি ঠাঁই পেয়েছে বলে আজও হোমারের কীর্তি অমলিন।

রূপান্তরকারী লেখক-পরিচিতি

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর জন্ম ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার বিক্রমপুরে। তিনি বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, লেখক ও চিন্তাবিদ। দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। তিনি 'নতুন দিগন্ত' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'দ্বিতীয় ভুবন', 'নিরাশ্রয় গৃহী', 'কুমুর বন্ধন' প্রভৃতি। শিশুদের পাঠ-উপযোগী গ্রন্থ 'অডিসি' তাঁর গুরুত্বপূর্ণ একটি রচনা। সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমিসহ বিভিন্ন পুরস্কার ও একুশে পদক পেয়েছেন।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

'অতিথি' গল্পটি মহাকবি হোমারের 'অডিসি' মহাকাব্যের একটি দীর্ঘ কাহিনির অংশ। কাব্য থেকে মূলভাব গ্রহণ করে এটি গদ্যরূপ দিয়েছেন লেখক। অডিসিয়ুস গ্রিক রাজাদের একজন, ইথাকা রাজ্যের রাজা। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি ট্রয়যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ট্রয়ের যুদ্ধের পর নিজের দেশে ফিরতে গিয়ে অডিসিয়ুসকেও পড়তে হয় বহু বিপদ ও সংকটে। একে একে মারা যায় সঙ্গীরা, ডুবে যায় জাহাজ। দেবী কেলিপসো তাঁর দ্বীপে তাকে বন্দি করে রাখতে চায় এই লোভ দেখিয়ে যে, অডিসিয়ুস চিরতরুণ আর অমর হয়ে থাকবেন পৃথিবীতে। অডিসিয়ুস সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন দেশপ্রেমের কারণে। পরে সেই দ্বীপ থেকে অডিসিয়ুস এসে পৌঁছান রাজা আলসিনৌসের রাজ্যে। সেখানে রাজকুমারীর সহযোগিতায় নগরে প্রবেশ করেন। রাজা ও রানি অডিসিয়ুসের পরিচয় পেয়ে খুশি হন। তাঁকে আশ্রয় দেন, আশ্বাস দেন নিজ দেশে পৌঁছে দেওয়ার।

গল্পটিতে দেশপ্রেম, রাজধর্ম, মহানুভবতা ও আতিথেয়তার পরিচয় বিধৃত হয়েছে।

শব্দার্থ ও টীকা

প্রাচীর — দেয়াল।
মাস্তুল — নৌকা বা জাহাজের পালের কাঠের খণ্ড।
দক্ষতা — পারদর্শিতা।
সোনার তৈরি যুবক — সোনার তৈরি যুবকের মূর্তি।
গণ্যমান্য — বিশিষ্ট বা বিশেষ মান্য।
আগন্তুক — আগত অচেনা ব্যক্তি।
ঘটনাচক্রে — হঠাৎ, ঘটনার ধারাবাহিকতায়।
অমরতা — মৃত্যুবিহীন জীবন।
উৎকণ্ঠা — কোনো কিছু ঘটতে পারে এমন ভেবে আশঙ্কা, দুঃশ্চিন্তা।
অতিপ্রাকৃতিক — যা বাস্তব নয়— এমন ঘটনা।
অভিসন্ধি — গোপন উদ্দেশ্য।
ফিসিয়ান — প্রাচীন গ্রিসের ফিসিয়া অঞ্চলের অধিবাসী।
ফিরিস্তি — বিবরণ।
অনিন্দ্যসুন্দর — এমন সুন্দর যে, নিন্দা করা যায় না।
অনুকূল — সহায়, পক্ষে।
তটভূমি — সমুদ্র বা নদীতীরের ভূমি।
বিচক্ষণ — জ্ঞানী, সুবিবেচক।
বৃত্তান্ত — বিবরণ।
স্বচ্ছন্দ — নিজের ইচ্ছায়, স্বাধীন।
আতিথেয়তা — অতিথির সেবা করতে ভালোবাসে এমন।
উদ্বেগ — কোনো কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা।
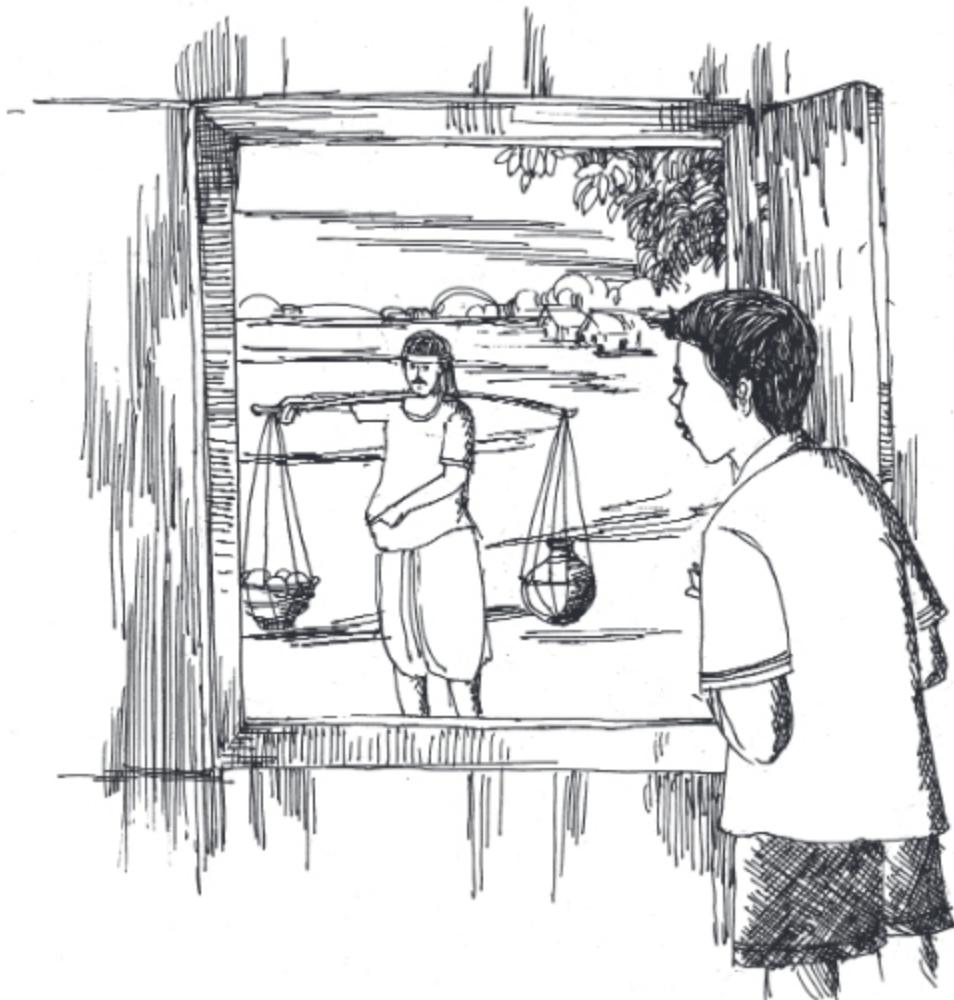
নাটিকা

অমল ও দইওয়ালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দইওয়ালা	:	দই—দই—ভালো দই!
অমল	:	দইওয়ালা, দইওয়ালা, ও দইওয়ালা!
দইওয়ালা	:	ডাকছ কেন? দই কিনবে?
অমল	:	কেমন করে কিনব! আমার তো পয়সা নেই।

দইওয়ালা : কেমন ছেলে তুমি। কিনবে না তো আমার বেলা বইয়ে দাও কেন?

অমল : আমি যদি তোমার সঙ্গে চলে যেতে পারতুম তো যেতুম।

দইওয়ালা : আমার সঙ্গে!

অমল : হাঁ। তুমি যে কত দূর থেকে হাঁকতে হাঁকতে চলে যাচ্ছ, শুনে আমার মন কেমন করছে।

দইওয়ালা : (দধির বাঁক নামাইয়া) বাবা, তুমি এখানে বসে কী করছ?

অমল : কবিরাজ আমাকে বেরোতে বারণ করেছে, তাই আমি সারা দিন এইখানেই বসে থাকি।

দইওয়ালা : আহা, বাছা তোমার কী হয়েছে?

অমল : আমি জানি নে। আমি তো কিচ্ছু পড়িনি, তাই আমি জানি নে আমার কী হয়েছে। দইওয়ালা তুমি কোথা থেকে আসছ?

দইওয়ালা : আমাদের গ্রাম থেকে আসছি।

অমল : তোমাদের গ্রাম? অনে—ক দূরে তোমাদের গ্রাম?

দইওয়ালা : আমাদের গ্রাম সেই পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায়। শামলী নদীর ধারে।

অমল : পাঁচমুড়া পাহাড়—শামলী নদী—কী জানি, হয়তো তোমাদের গ্রাম দেখেছি—কবে সে আমার মনে পড়ে না।

দইওয়ালা : তুমি দেখেছ? পাহাড়তলায় কোনোদিন গিয়েছিলে নাকি?

অমল : না, কোনোদিন যাইনি। কিন্তু আমার মনে হয় যেন আমি দেখেছি। অনেক পুরোনো কালের খুব বড়ো বড়ো গাছের তলায় তোমাদের গ্রাম— একটি লালরঙের রাস্তার ধারে।

দইওয়ালা : ঠিক বলেছ বাবা।

অমল : সেখানে পাহাড়ের গায়ে সব গরু চরে বেড়াচ্ছে।

দইওয়ালা : কী আশ্চর্য! ঠিক বলছ। আমাদের গ্রামে গরু চরে বইকি, খুব চরে।

অমল : মেয়েরা সব নদী থেকে জল তুলে মাথায় কলসি নিয়ে যায়—তাদের লাল শাড়ি পরা।

দইওয়ালা : বা! বা! ঠিক কথা। আমাদের সব গয়লাপাড়ার মেয়েরা নদী থেকে জল তুলে তো নিয়ে যায়ই। তবে কিনা তারা সবাই যে লাল শাড়ি পরে তা নয়— কিন্তু বাবা, তুমি নিশ্চয় কোনোদিন সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলে!

অমল : সত্যি বলছি দইওয়ালা, আমি একদিনও যাইনি। কবিরাজ যেদিন আমাকে বাইরে যেতে বলবে সেদিন তুমি নিয়ে যাবে তোমাদের গ্রামে?

দইওয়ালা : যাব বইকি বাবা, খুব নিয়ে যাব!

অমল : আমাকে তোমার মতো ওইরকম দই বেচতে শিখিয়ে দিয়ো। ওইরকম বাঁক কাঁধে নিয়ে— ওইরকম খুব দূরের রাস্তা দিয়ে।

দইওয়ালা : মরে যাই! দই বেচতে যাবে কেন বাবা? এত এত পুঁথি পড়ে তুমি পণ্ডিত হয়ে উঠবে।

অমল : না, না, আমি কক্ষনো পণ্ডিত হবো না। আমি তোমাদের রাঙা রাস্তার ধারে তোমাদের বুড়ো বটের তলায় গোয়ালপাড়া থেকে দই নিয়ে এসে দূরে দূরে গ্রামে গ্রামে বেচে বেচে বেড়াব। কী রকম করে তুমি বল, দই, দই, দই—ভালো দই। আমাকে সুরটা শিখিয়ে দাও।

দইওয়ালা : হায় পোড়াকপাল! এ সুরও কি শেখবার সুর!

অমল : না, না, ও আমার শুনতে খুব ভালো লাগে। আকাশের খুব শেষ থেকে যেমন পাখির ডাক শুনলে মন উদাস হয়ে যায়— তেমনি ওই রাস্তার মোড় থেকে ওই গাছের সারির মধ্যে দিয়ে যখন তোমার ডাক আসছিল, আমার মনে হচ্ছিল— কী জানি কী মনে হচ্ছিল!

দইওয়ালা : বাবা, এক ভাঁড় দই তুমি খাও।

অমল : আমার তো পয়সা নেই।

দইওয়ালা : না না না না— পয়সার কথা বোলো না। তুমি আমার দই খেলে আমি কতো খুশি হব।

অমল : তোমার কি অনেক দেরি হয়ে গেল?

দইওয়ালা : কিচ্ছু দেরি হয়নি বাবা, আমার কোনো লোকসান হয়নি। দই বেচতে যে কতো সুখ সে তোমার কাছে শিখে নিলুম।
[প্রস্থান]

অমল : (সুর করিয়া) দই, দই, দই, ভালো দই! সেই পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায় শামলী নদীর ধারে গয়লাদের বাড়ির দই। তারা ভোরের বেলায় গাছের তলায় গরু দাঁড় করিয়ে দুধ দোয়, সন্ধ্যাবেলায় মেয়েরা দই পাতে, সেই দই। দই, দই, দই—ই, ভালো দই!

লেখক-পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে (পঁচিশে বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, গীতিকার, সুরকার, নাট্যকার, নাট্য-নির্দেশক, অভিনেতা এবং চিত্রশিল্পী। বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতনের মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তিনি শিক্ষায় নতুন ধারা সৃষ্টি করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'সোনার তরী', 'গীতাঞ্জলি' ও 'বলাকা' প্রভৃতি কাব্য; 'ঘরে বাইরে', 'যোগাযোগ', 'গোরা' প্রভৃতি উপন্যাস; 'বিসর্জন', 'ডাকঘর', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি নাটক;

'গল্পগুচ্ছ' গল্পসংকলন। 'শিশু ভোলানাথ', 'খাপছাড়া' প্রভৃতি তাঁর শিশু-কিশোরদের জন্যে লেখা বই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'আমার সোনার বাংলা' গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়েছে। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট (বাইশে শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

নাট্যাংশটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ডাকঘর' নাটক থেকে নেওয়া হয়েছে। এ নাটিকায় কিশোর অমলকে কবিরাজ ঘরের বাইরে যেতে বারণ করায় সে প্রায় ঘরবন্দি। কিন্তু তার মন পড়ে আছে বাইরের পৃথিবীতে। একদিন অমলের ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দইওয়ালার সঙ্গে অমলের ভাব হয়। অমলের মনে বাইরের জগৎ, প্রকৃতি ও মানুষ নিয়ে অনেক কৌতূহল, অনেক প্রশ্ন। সে কখনো দইওয়ালার গ্রামে যায়নি, অথচ তার কল্পনাপ্রবণ মন– ঠিক ঠিক বলে দেয় শামলী নদীর তীরের দইওয়ালার গোয়ালপাড়া গ্রামের নানা দৃশ্যের কথা! দইওয়ালা শুনে অবাক হয়। অমল বলে সে-ও দইওয়ালা হতে চায়। কেননা, সে বই পড়ে পণ্ডিত হতে চায় না। বরং দইওয়ালার 'দই' 'দই' সুরটাই সে শিখে নিতে চায়।

নাট্যাংশটিতে কিশোর মনের কল্পনা, প্রকৃতি ও সহজ-সরল জীবনের প্রতি ভালোবাসার প্রতিফলন ঘটেছে।

শব্দার্থ ও টীকা

হাঁকতে হাঁকতে	– জোরে শব্দ করে ডেকে কিছু ঘোষণা করতে করতে।
দধি	– দই।
বাঁক	– বাঁশ দিয়ে তৈরি একধরনের বাঁকানো দণ্ড, যার দুপ্রান্তে মালপত্র ঝুলিয়ে কাঁধে করে বহন করা হয়।
বইকি	– নিশ্চয়তা, আগ্রহ ইত্যাদি বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।
কবিরাজ	– চিকিৎসক। বনজ উপকরণ দিয়ে চিকিৎসা করেন এমন ব্যক্তি।
গোয়ালপাড়া	– যেখানে গোয়ালারা বসবাস করেন।
লোকসান	– ক্ষতি।
ভাঁড়	– ছোটো মাটির পাত্র।
দোয়	– দোহন করে।
পাতে	– বানায়। যেমন– দই পাতে > দুধ থেকে দই বানায়।

ভ্রমণ-কাহিনি

বিলাতের প্রকৃতি

মুহম্মদ আবদুল হাই

বৃষ্টি-নেশাভরা লন্ডনের সন্ধ্যাবেলায় ছোট্ট ঘরটিতে বসে জানালার ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছি। যতদূর চোখ যায় শুধু দেখছি, লন্ডনের বাড়িঘরগুলোর চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ধোঁয়ায় আর মেঘেঢাকা লন্ডন পাথরের মতো বুকের ওপর চেপে বসেছে। মনে মনে ফিরে গেলাম আট হাজার মাইল দূরে, রাজশাহীর যে বাসাটায় আমার পরিজনেরা বাস করছে সেখানে। ওখানে হয়তো এরও চেয়ে ঘনকালো মেঘ করেছে। বাংলাদেশের আষাঢ়ের মেঘ— যেমন গম্ভীর তেমনি কালো। হয়তো নেমেছে ঘন বর্ষা। অবিরল ধারাবর্ষণের মধুর রোল গানের অনুরণনের মতো কেঁপে কেঁপে তাদের হয়তো নিদ্রাকাতর করে দিয়েছে।

মা, মাতৃভাষা আর মাতৃভূমির মতো আর কিছু কি এমন মিষ্টি আছে? সে জন্যই বাংলাদেশের কথা বলতে গিয়ে বাংলার কবি লিখেছেন–

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি।

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত– এ ছয় ঋতুর লীলা আমাদের দেশে। কিন্তু এখানে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ছাড়া শরৎ, হেমন্ত ও বসন্ত কখন আসে, কখন যায় তা চোখেই পড়ে না।

ইংল্যান্ডের বসন্তকাল কিন্তু ভিন্ন ধরনের। মার্চ মাস শেষ হতে-না-হতেই তরুলতায় পাতার মুকুল দেখতে পেলাম। আজ এ গাছে চাই তো দেখি, যেখানে যতটুকু পাতা বেরোনো সম্ভব তাতেই অঙ্কুর গজিয়ে উঠেছে। কাল যদি খেয়াল করি তো দেখি, আরও বেড়ে গেছে। সন্ধ্যায় একরকম দেখি তো সকালে অন্যরকম। আরও সুন্দর, আরও ভালো। প্রকৃতির যে দিকে চাই সেদিকেই দেখি, যেন সুন্দরের আগুন লেগে আছে।

ছোটো ছোটো গাছে পাতা নেই। শুধু ফুল। অনাবিল সৌন্দর্যের এই খেলা দেখবার জন্য এখানকার পার্কগুলো। ডালপালার হাত-পা মেলে দেওয়া আমাদের মাথাসমান উঁচু ফুলের গাছ সারি সারি সাজানো। কতকগুলোতে শুধু সাদা ফুল। কতকগুলোতে লাল, নীল, হলদে, বেগুনি। ভারি ভালো লাগে তার নিচে গিয়ে দাঁড়াতে।

রিজেন্ট পার্ক আমার বাসা থেকে মিনিট তিনেকের পথ। প্রকৃতির সৌন্দর্যের দিক দিয়ে এটি লন্ডনের সেরা পার্ক। এ পার্কের গোলাপ-বাগানের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। বাগানটি রানি মেরির নামের সঙ্গে জড়ানো। জুন, জুলাই– এ দুমাস গোলাপফুলের। মেরির গোলাপ-বাগানের গোলাপেরা কেউ ফুটেছে–কেউবা ফুটে রৌদ্র-স্নানরত নরনারীর চোখ জুড়াচ্ছে, মন ভোলাচ্ছে। নানা রঙের এত গোলাপ একসঙ্গে পাশাপাশি ফুটতে দেখলে নিতান্ত বেরসিকের প্রাণও রসোচ্ছল হয়ে উঠবে তাতে বিচিত্র কী? রোদে ভরা ছুটির দিনগুলোতে রিজেন্ট পার্ক ও কিউ-গার্ডেনে এখানকার মালিদের হাতে-গড়া গোলাপবাগের জান্নাতি পরিবেশ দেখে মন জুড়িয়ে যাচ্ছে। অপরিমেয় ফুলের রঙে চোখে লাগছে নেশা আর ফুলেরই মনোরম স্নিগ্ধ গন্ধে বাতাস হয়েছে মোহকর।

বসন্ত ও গ্রীষ্মের এক এক মাসে এক এক রকম ফুল এখানকার বৈশিষ্ট্য। আবার একই ফুলের কত যে বৈচিত্র্য তা বলে শেষ করা যায় না। এপ্রিল মাসে দেখলাম লাইলাক ফুলে রিজেন্ট পার্ক ছেয়ে গেছে। বেগুনি আর আসমানি রঙের লাইলাক। ইংল্যান্ডের এত ফুলের মধ্যে শুধু লাইলাকেই গন্ধ পেলাম।

মে মাস ছিল টিউলিপ, উইলো আর ডেইজির। টিউলিপ আমাদের দেশের ধুতুরা ফুলের মতো। কেবল ফুলটুকু ছাড়া আর কিছুর সঙ্গে ওর সাদৃশ্য আঁকা যাবে না– পাতার সঙ্গে নয়, পাপড়ি বা দল কিছুরই সঙ্গে নয়। বাইরে কিছুটা সাদৃশ্য আছে, এতটুকু বলা যায়। আকারে টিউলিপ ধুতুরা ফুলের চেয়ে অনেক ছোটো। বলিহারি যাই টিউলিপের রং দেখে। কোনো জায়গায় দুধের চেয়েও সাদা। কোনো জায়গায় রক্তের চেয়ে লাল। কোনোটায় বেগুনি, কোনোটায় জাফরানি, কোনোটায় ধুপছায়া। কোনোটা দুধে-আলতা মাখানো। কোনোটা হলুদ।

কোনোটায় থাকে প্রজাপতির গায়ের রেখাটানা বিচিত্র রঙের কারুচিত্র। থাকের পর থাক। টিউলিপে টিউলিপময়। ইংরেজজাত ফুলের যে কী ভক্ত এবং ফুলের রঙে যে এদের কী আনন্দ এ থেকে এ কথাই বারবার মনে পড়ে।

মাটিতে যেদিকে চাইছি— দেখছি ঘাসেও ফুল। সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাদের মাঝে ঘাস এখানে ছোটো হয়ে নেই। সবার আনন্দের ভাগ সে-ও যাতে ভোগ করতে পারে তার জন্য তারও বুক ফুলে ভরে রয়েছে। এই ঘাসফুলের অণু-পরমাণুগুলোর নাম ডেইজি। আর মেয়েদের কানফুলের মতো যেগুলো সেগুলো ক্রোকাস। মিষ্টতায় ভরা ফুলগুলো।

এপ্রিল, মে ও জুন এই তিন মাসে ইংল্যান্ডের সৌন্দর্য চোখ ভরে দেখেছি। এপ্রিলে এর সূচনা আর সেপ্টেম্বরে পরিণতি। জুন-জুলাই-আগস্ট এখানকার গরমকাল। কিন্তু মে মাস থেকে ইংল্যান্ডের প্রকৃতিতে এ কী শুরু হলো! আমাদের সবুজ এদেশের সবুজের কাছে ফিকে হয়ে যায়। আমাদের ধানখেতের ওপর দিয়ে বাতাস যখন ঢেউ খেলে যায়,তখন হাল্কা মনোহর সবুজের কম্পন মাঠের প্রত্যন্ত প্রদেশে পর্যন্ত ছড়িয়ে যেতে দেখি। তাতে মন ভরে। চোখ জুড়ায়। এদের ধানখেত নেই, কেননা ভাত এদের খাবার নয়। পার্কে সবুজ আর নীল দৃশ্য দেখে লোভ হলো এদের গ্রাম আর মাঠের শোভা দেখতে।

কোচে চড়ে সেদিন ক্যামব্রিজ বেড়িয়ে এলাম। আমাদের দেশের গ্রামছাড়া ওই রাঙামাটির পথ আমাদের মন ভুলায়, কিন্তু এদেশের মাঠের মাঝখান দিয়ে পিচঢালা পথের বুকের ওপর দিয়ে বাদশাহি কোচগাড়ি যখন ছুটে চলে, তখন দুপাশের গাছপালার সবুজ ফুলের অনন্ত বৈচিত্র্য আর লতাপাতার ঘন নীলিমা চোখের ওপর মধু-মায়া অঞ্জন লাগিয়ে দিয়ে যায়। দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ। খাড়া-উঁচু, সোজা-নিচু বা একটানা সমতল নয়। তাতে কোথাও বাজরার খেত। কোথাও সরিষার ফুলের মতো সারা মাঠ ছড়ানো ফিকে আর গাঢ় হলুদের বিছানা পাতা। তার পাশে গোচারণভূমি। তার নিচে বহু বিচিত্র শস্যখেত। অপরূপ শ্যামলে-সবুজে, বেগুনে-হলুদে, নীলে-লালে আর বিচিত্র আভায় প্রভায় গায়ে গায়ে লেগে থেকে সৌন্দর্যের সে কী প্লাবন বইয়ে দিচ্ছে। প্রকৃতির এত রূপ, এত নিটোল স্বাস্থ্য, মে-জুনের ইংল্যান্ড না-দেখলে কখনও কি তা বিশ্বাস করা যায়?

সে যা হোক। সূর্যের স্নিগ্ধ রোদে কদিন থেকে সারা ইংল্যান্ড বিধৌত হচ্ছে। এ মাসটা ধরেই দেখছি প্রতি শনি-রবিবারে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়ির কর্তা-গিন্নি থেকে আরম্ভ করে ছোটো কচি বাচ্চারা পর্যন্ত পার্কে এসে রোদ পোহাচ্ছে। রোদ স্বাস্থ্যের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। সূর্য যখন এতকালের কৃপণতার পর মাসখানেক ধরে অকৃপণভাবে আলো দিতে লেগেছে তখন তার কিরণ তো মন প্রাণ-ভরে পান করা চাই।

প্রকৃতিতে যখন এমন সৌন্দর্যের সমারোহ, বিচিত্র রঙে যখন সারা ইংল্যান্ড রাঙা হয়ে উঠল, সবুজে-নীলে মিতালি-পাতানো যখন স্বদেশিদের তো বটেই, আমাদের মতো বিদেশিদের মনেও এদেশকে ভালোবাসার নেশা জাগাল। তাই বুঝি ইংল্যান্ডে এত পার্ক। এত ফুল। এত বিশ্রামকুঞ্জ। আর গ্রীষ্মকালকে কেন্দ্র করে জীবনের এত আয়োজন। ইংল্যান্ডের গ্রীষ্মকালের খ্যাতি দুনিয়াজোড়া। শীতের মতো শুষ্ক বলে নয়, স্নিগ্ধ রোদে-ভরা মধুর বলে।

লেখক-পরিচিতি

মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন ভাষাবিদ, শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক। 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' মুহম্মদ আবদুল হাই রচিত ভাষাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এছাড়াও 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি', 'তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা', 'ভাষা ও সাহিত্য', 'বিলাতে সাড়ে সাতশ দিন' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর মেধা ও মননের সাক্ষ্য বহন করে। প্রবন্ধ ও গবেষণামূলক গ্রন্থের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

রচনাটি মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের 'বিলাতে সাড়ে সাতশ দিন' গ্রন্থের অংশবিশেষ। এখানে লন্ডনের মনোরম প্রকৃতি চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমে চিমনির ধোঁয়া আর মেঘে ঢাকা লন্ডন লেখকের মন বিষাদে ভরে দিলেও ধীরে ধীরে ইংল্যান্ডের প্রকৃতির অপরূপ শোভা সেই বিষণ্ণতা কাটিয়ে তাঁকে মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন করে। প্রকৃতিতে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা– এই তিন ঋতুর প্রাধান্য থাকলেও ভিন্ন ধরনের এক বসন্তকাল এখানে চোখে পড়ে। বসন্তকালে ইংল্যান্ডের প্রকৃতি লেখকের ভাষায় 'সুন্দরের আগুন'। রিজেন্ট পার্ক সৌন্দর্যের দিক থেকে ইংল্যান্ডের সেরা পার্ক। যেখানে গোলাপের সৌন্দর্য দেখলে যে-কোনো বেরসিকের প্রাণেও রসের সঞ্চার হবে। লাইলাক, টিউলিপ, উইলো, ডেইজি প্রভৃতি বিচিত্র ফুলের সমারোহ ইংল্যান্ডকে করেছে আকর্ষণীয়। মে ও জুন মাসে শস্যখেতের বিচিত্র রূপ যেন সৌন্দর্যের প্লাবন বইয়ে দেয়। আবার শীতের অবসানে গ্রীষ্মের আকাশে যখন সূর্যের উদয় হয়, তখন ইংল্যান্ডের সব-বয়সি মানুষ স্নিগ্ধ রোদ পোহায়। সব মিলিয়ে নানা ঋতুর বিচিত্র রূপ, সাজানো পার্ক আর পার্কের নানা জাতের ফুলের সমারোহ বিলেতের প্রকৃতিকে মনোহর করে তোলে।

প্রকৃতির প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও মুগ্ধতা সহজাত। রচনাটিতে সে ভালোবাসা ও মুগ্ধতার প্রকাশ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

শব্দার্থ ও টীকা

চিমনি — ধোঁয়া বের হওয়ার নল বা চোঙা।
পরিজন — স্বজন। পরিবারের লোক।
ধারাবর্ষণ — বৃষ্টি।
অনুরণন — কম্পন।
নিদ্রাকাতর — ঘুমে কাতর।
তরুলতা — গাছের লতা।
অঙ্কুর — মুকুল, কলি।
অনাবিল — স্বচ্ছ, অকলুষিত।
রৌদ্র-স্নানরত — রোদ পোহানো।
বেরসিক — রসহীন লোক।
রসোচ্ছল — রসে ভরা।
রিজেন্ট পার্ক — লন্ডন শহরের একটি পার্ক।
কিউ-গার্ডেন — লন্ডনের একটি পার্কের নাম।
জান্নাত — বেহেশত, স্বর্গ।

অপরিমেয়	— অগণিত।
মনোরম	— সুন্দর।
মোহকর	— মুগ্ধতা তৈরি করে এমন।
সাদৃশ্য	— একই রকম।
বলিহারি	— ভাষা হারিয়ে ফেলা।
জাফরানি	— রঙের নাম।
ধুপছায়া	— রোদ ও ছায়ার মিশ্রণ।
কারুচিত্র	— কাঠে খোদাই করা ছবি।
কানফুল	— কানের অলংকার।
ফিকে	— ঝাপসা হয়ে যাওয়া।
ক্যামব্রিজ	— লন্ডনের অদূরে একটি স্থানের নাম। এ নামে স্থাপিত হয়েছে বিখ্যাত ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়।
কোচগাড়ি	— একধরনের গাড়ি।
অঞ্জন	— কাজল।
দিগন্ত বিস্তৃত	— শেষপ্রান্ত পর্যন্ত।
বাজরা	— এক প্রকার শস্য।
গোচারণভূমি	— যেখানে গরু চরানো হয়।
প্লাবন	— বন্যা।
বিধৌত	— বিশেষভাবে ধোয়া হয়েছে এমন।
মিতালি	— বন্ধুত্ব।
বিশ্রামকুঞ্জ	— বিশ্রামের স্থান।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

ষষ্ঠ–আনন্দপাঠ

মিতব্যয়ী কখনও দরিদ্র হয় না।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।